ছাত্র আন্দোলনের ইউটোপিয়া : অগাস্ট অভ্যুত্থান ২০০৭

মাহমুদ হাছান

উৎসর্গ

রাজশাহীতে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ চলাকালে নিহত
রিকশাশ্রমিক আনোয়ার হোসেন
ও
মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ছাত্রনেতা সুজত দে মলয়

ক্রিটিক বক্তৃতামালা-১

স চি

২০শে আগস্ট : হেগেল থেকে হাসপাতাল ৩
২১ আগস্ট : বারুদগন্ধী শরৎ সকাল ৭
বালিয়াড়ি বিকাল ১১
বিপ-বের চুলকানি ১৩
আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে ১৪
নির্বিচারে গ্রেফতার, টর্চার, মামলা, তথ্য অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ ১৬
প্রতিজ্ঞাপাশে প্রত্যাবর্তন : আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় ১৭
মামলার অগ্রগতি ও আন্দোলনের পরিণতি ২০
শামসুদ্দোজা সাজেনের সাক্ষাৎকার ২১
ফখরুদ্দিনের ফুঁ : বিক্ষোভের পটভূমি ২৬
সামরিক কনভয়ের হেডলাইটে ত্রস্ত ক্যাম্পাস ২৮
ছাত্র বিক্ষোভের শ্রেণিগত তাৎপর্য ২৮
ছাত্র আন্দোলনের সহিংসতা নিয়ে জনমনে শহুরে মধ্যবিত্ত ও পলিটিক্যাল এলিটদের প্রচারণার প্রভাবের একটি পর্যালোচনা ৩১

প্রকাশক
হিমাদ্রি দেবনাথ
ও
মনোয়ার মুন
৩২৫ জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
যোগাযোগ : ০১৫৫৮৫৪০১৪০, ০১৫৫২৭০৫০৪২

আমাদের সমুদ্রে ফেনায়িত জলরাশি
থই থই, উঁচু উঁচু পাহাড়গুলো আকাশ
ছুঁই ছুঁই, এখানে পিপাসা পাখির নেই আনাগোনা
নীল-কালো মেঘ ছুঁয়ে যায় চাতকের ডানা।

আমাদের বাওনী বুড়ি, এত ধীরে কদমে হাঁটে
কদমের মৌসুম ফুরোবার আগেই সে পাটে;
আমাদের বালিকারা আসে যায়, খুনসুটি করে
মৌসুমে মৌসুমে বকুল ফোটে
আর সেই বকুলের মালা হাতে, বালিকারা ছোটে
আমিও হেঁটে যাই হাটে, যদি আশ মেটে!

২০শে অগাস্ট : হেগেল থেকে হাসপাতাল

দীর্ঘ পাঠের ক্লান্তি কাটাতে সেন্ট্রাল লাইব্রেরির কাউন্টারের সামনে মুজিব, ফারুক ভাইসহ বিপ-বী লেখক সংঘর আরও কয়েকজন বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। আড্ডার বিষয় হেগেল। সেদিন বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে সামনে দিয়ে ছাত্র ফেডারেশনের একটা গ্রুপ যাচ্ছিল। ওদের সাথে হাবিবও ছিল। হাবিবকে ডেকে গন্তব্য কোথায় জিজ্ঞেস করার পর শুনতে পেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সাংবাদিকতা ও লোকপ্রশাসন বিভাগের খেলা চলাকালে লোকপ্রশাসন বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র মেহেদী ছাতা উঠালে পেছনে বসে থাকা সেনাসদস্যরা কঠোর ভাষায় তা নামাতে বলে। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সেনা সদস্যরা মেহেদীর উপর চড়াও হয়। এবং মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে লাথি মারে ও ক্যাম্পে তুলে নেয়ার চেষ্টা করলে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা বাধা দেয়। সেনারা সাথে সাথে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলে পড়ে। সেনাসদস্যদের হামলায় লোকপ্রশাসনের দিপু, শফি, লোকাস ও মারুফ নামের চার ছাত্র গুরুতর আহত। অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে উপস্থিত মুবাশ্বের মুনায়েম স্যার সংঘাত ঠেকানোর চেষ্টা করলে তাকেও সেনা সদস্যরা অপমান করে। ঘটনাটা খুব সিরিয়াসলি নিইনি। কারণ সাংবাদিকতা বিভাগের ছেলেরা এমনিতেই হৈহুলে-াড়ের মেজাজে থাকে, তাছাড়া এইসব বামপন্থীরা সারাদিন মধুতে বসে বসে ঝিমায়, চায়ের কাপে টুং টাং সুর তুলে চামচ নাড়ে আর মাঝে মাঝে অলসতাজনিত ক্লান্তি দূর করার জন্য মিছিলের নামে বাহুর ব্যায়াম ও গলার ব্যায়ামে নামে। বামপন্থীদের এই মিছিল মিটিংও খামোখা সিরিয়াসনেস নিয়ে কিছুক্ষণ ঠাট্টা তামাশা করে আমরা ফিরে যাই হেগেলে। বেশ কয়েকদিন ধরে আমাদের মাঝে অন্যরকমের উত্তেজনা কাজ করছিল। লাইব্রেরিতে হেগেলের তিনখণ্ডে দর্শনের ইতিহাস আবিষ্কার করে বেশ কদিন ধরে একটা চিন্তা মাথায় কাজ করছিল, কি করে এই বই হস্তগত করা যায়। হেগেলের ছাত্ররা হেগেলের দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসের বিষয়ক বক্তব্যগুলো একত্রিত করে তার মৃত্যুর পর ঐ সংকলন প্রকাশ করেছিল। সেই থেলিস হতে শেলিং পর্যন্ত গ্রিক, ভারত, চীন, পারস্য, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্সসহ তাবৎ বিশ্বের দার্শনিকদের উপর প্রাঞ্জল আলোচনা। গৌণ প্রধান বিবেচনার দর্শনের ইতিহাসের বইয়ে বাদপড়া অনেক দার্শনিকদের চিন্তাও সেখানে বাদ পড়েনি। আয়তনে প্রায় দুইহাজার পৃষ্ঠা, বিশ্বাসই

করতে পারছিলাম না হেগেলের মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক এ ধরনের বই লিখে গেছেন অথচ আমার দর্শন বিভাগের দর্শনের ইতিহাস বিষয়ক কোর্সগুলোর কোনোটার রেফারেন্সেই এই বইয়ের উলে-খ নেই। আযম স্যারকে বইটার খবর জানানো হয়েছে। সন্ধ্যায় লাইব্রেরি থেকে বইটা তুলে দেবার জন্য তিনি আসছেন। বইটা আমার হস্তগত হবে এই আনন্দে আমি রীতিমত শিহরিত। সন্ধ্যায় স্যার এলেন। বই তুলে স্যারের পিছুপিছু আমি ও মুজিব বেরুচ্ছি। লাইব্রেরি থেকে বেরিয়েই দেখি একটা মিছিল আসছে। ৩০-৪০ জন হবে। অধিকাংশই চেনামুখ। বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীর সাথে সাংবাদিকতা বিভাগের মাঠ ফেরত ক্লান্ত কিছু ছাত্র, পোগান দিচ্ছিলেন সাজেন ভাই 'আমার ভাই আহত কেন প্রশাসন জবাব চাই', 'অবিলম্বে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করতে হবে'। মিছিলটা লাইব্রেরি ছাড়িয়ে আইএমএল-এর গেটের সামনে গেলে সেখানে উপস্থিত ৫০-৬০ জন পুলিশের ব্যারিকেড মিছিল আটকে দেয়। মিছিলের অমোঘ আকর্ষণ কখনো এড়াতে পারিনি। স্যারের হাতে বইগুলো সপে দিয়ে সব নেতিবাচক চিন্তা পাশ কাটিয়ে দিলাম ভো দৌড়। গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাথে পুলিশের ধাক্কাধাক্কিতে যোগ দিলাম। শুনতে পেলাম সন্ধ্যায় সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা ভিসি অফিসে বিক্ষোভ করতে গেলে সেখানে অবস্থান নেয়া পুলিশ সদস্যরা তাদের উপর হামলে পড়ে এবং তাদের নির্মম লাঠিচার্জে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী আহত হয়। দেশে তখন জরুরি অবস্থা চলছিল। রাজপথে সভা, সমিতি, মিছিল মিটিং করা নিষিদ্ধ। এক উপস্থিত মহিলা এসপি সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ছাত্রদের মিছিল নিবৃত করা চেষ্টা করছিল। বাকি পুলিশ তখন পর্যন্ত রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে মারমুখি ছাত্রদের সামলানোর চেষ্টা করছিল। পুলিশের সাথে প্রায় ১৫ মিনিট ধাক্কাধাক্কি শেষে উপস্থিত সিনিয়র নেতারা মিছিল না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে লাইব্রেরি গেটে ফিরে আসে। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতারা ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, সেনা সদস্যদের দ্বারা ছাত্রদের প্রহারের ঘটনার জন্য দায়ী সেনাদের কঠোর শাস্তি ও সেনা প্রধানকে এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে দাবি করে ছাত্রদের জরুরি অবস্থার শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করার অনুরোধ জানায়। সমাবেশে মানবদা, নান্টু দা ও সাজেন ভাই বক্তব্য রেখেছিল। তারা পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহ্বান করে ও দাবি মানা না হলে কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দেন।

সমাবেশ শেষে আমি, মুজিব, রাসেল, ডালিম ভাইসহ আরো ১০-১২ জন ছেলে লাইব্রেরির সামনে অবস্থান করছিলাম। পাশেই অবস্থান নিয়েছিল সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা। প্রগতিশীল জোটের নেতাদের আদেশ অমান্য করে আমি, মুজিব, রাসেল, ডালিম ভাইসহ বিপ-বী লেখক সংঘের কয়েকজন কর্মী হলে হলে মিছিলযোগে ধর্মঘটের প্রচারণা চালানোর জন্য মিছিল নিয়ে উত্তরপাড়ার হলগুলোর দিকে এগিয়ে যাই।

আমি আমার হল সূর্যসেনে প্রবেশ করি। টিভি রুমে তখন উপচেপড়া ভিড়। যেন কোথায় কিছু হয়নি। আমি টিভি রুমে ঢুকেই প্রচণ্ড উত্তেজিত অবস্থায় ছাত্রদের উপর সেনাদের হামলা ও তৎপরবর্তী ঘটনা তুলে ধরলাম এবং মিছিলে যোগ দেয়ার আহ্বান জানালাম। খবরটা হলের ছাত্রদের উত্তেজিত করে তুলেছিল। টিভি রুমে উপস্থিত ছাত্রদের মাঝ থেকে প্রায় ৩০-৪০ জন ছাত্র বেরিয়ে এসে মিছিলে যোগ দিল। আমরা ক্রমান্বয়ে মুজিব হল, জিয়া হল, জসীম উদ্দীন হল প্রদক্ষিণ করলাম। প্রত্যেক হল থেকে ছেলেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সাথে যোগ দিল। একে একে মহসিন হল, এফ রহমান হল, জহুরুল হক হল পার হলে আমি মিছিলের অবয়ব দেখে শিউরে উঠি। ততক্ষণে প্রায়

৪-৫শ ছেলে এসে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে।

বুদ্ধিজীবী চত্বরে আসার পর পুলিশের একটা প্রিজনভ্যান দেখে হঠাৎ মিছিল সহিংস হয়ে উঠে। ভ্যানের ভিতরে বা আশেপাশে কোনো পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি না দেখে ছাত্ররা লাঠিসোটা ও ইটপাটকেল দিয়ে গাড়িটি ভাংচুর করে। ছাত্রদের ক্ষোভের কী ভয়াবহ প্রকাশ ছিল সেটা! অনেক ছাত্রকে দেখেছিলাম রাগের অতিমাত্রায় গাড়ির গায়ে লাথি মারছে। সেখান থেকে ছোট একটা দল এস.এম হলের দিকে এগোয়। আমরা ম ল মিছিল নিয়ে জগন্নাথ হল অভিমুখে রওনা হলাম। তীব্র পোগান আর গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পি ত করে মিছিল রোকেয়া হল পেরুে ছ। মিছিলের অগ্রভাগে আমরা ১০-১৫ জন হাতে হাত ধরে মানব দেয়াল তুলে এগু ছ, মিছিলের সে কি গতি, আমাদের হাতের বাঁধন ছিঁড়ে মিছিল এগুতে চা ছ, আমরা দাঁতে দাঁত চেপে পেছনের চাপ সামলা ছ। এর মাঝে টিএসসিতে অবস্থানরত ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফ্রন্টের নেতাকর্মীরা মিছিলে এসে যোগ দেয়। মলয়দা ও খোমেনীকে টিএসসি থেকে মিছিলের দিকে দৌড়ে আসতে দেখি। মুহ র্তের মধ্যে মিছিলের পোগন বদলে গেল। আমি স্প ষ্ট শুনতে পা ছিলাম কারা যেন পেছন থেকে পোগান দি ছ 'চল চল জিমনিসিয়াম চল' টিএসসির সড়কদ্বীপ পেরিয়ে রাস্ া টা অনেক প্রশস্ হয়ে গেছে। ফলে আমাদের হাতের বেষ্টনীর বাইরে দুদিকে প্রায় ৫-৬ গজ করে বাড়তি জায়গা তৈরি হয়েছে। এতক্ষণ আমাদের হাতের বেষ্টনী দিয়ে পুরো রাস্ া কভার করা যা ছিল তাই আমরা মিছিলটা নিয়ন্ ণ করতে পারছিলাম, এবার আর পারা গেল না। আমরা হতভম্ব হয়ে দেখছি ওই বাড়তি ফাঁকা জায়গা দিয়ে দলে দলে ছাত্ররা জিমনিসিয়াম অভিমুখে দৌড়াে ছ। রাস্ া প্রশস্ তর হওয়ার কারণে আমাদের হাতের বেষ্টনী দিয়ে আর কভার করা যা ছিল না। ঘটনাটা আসলে টিএসসির মোড়েই প্রথমবার মোড় নিয়েছিল। আমাদের জিমনিয়াম যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল না। মিছিলটার উদ্দেশ্য ছিল হলে হলে ২১ তারিখের ধর্মঘটের প্রচারণা চালানো। পরবর্তীতে খোমেনী ইহসান সংসদীয় কমিটির কাছে তার লিখিত সাক্ষ্যে দাবী করেছে মিছিলকে পথভ্রান্ করে জিমনিয়ামে হামলা চালানোর পরিকল্পনায় ছিল সে ও ছাত্র ইউনিয়নের প্রয়াত নেতা সুজত দে মলয়।

হতভম্ব পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে আমি ও তাদের অনুসরণ করে দৌড় শুরু করি। যখন থামলাম দেখি সামনে জিমনিসিয়াম। গেটে ধুমধাম লাথি পড়ছে। এরই মাঝে একদল ইটের টুকরো সংগ্রহ করে ভিতরে অবস্থিত সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ে মারছে। মোটা মোটা দুটো বাঁশ দিয়ে দুজন জিমনিসিয়ামের গেটে আঘাত করছে। এর ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে ত্রস্ হয়ে মানবদাসহ আমরা কজন ছাত্রদের নিবৃত করার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল দোয়েল চত্বর থেকে এক ঝাঁক পুলিশ পুরো রাস্ া ব-ক করে এগুে ছ। বাঁয়ের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি শহীদ মিনারের দিক থেকেও একইভাবে রাস্ া ব-ক করে পুলিশ এগুে ছ। অর্থাৎ জিমনিসিয়াম গেট থেকে পালানোর দুটো পথই অবরুদ্ধ। তখনই বদ্ধ গেটের ভেতর থেকে সামরিক হুঙ্কার আর বুটের তাল তুলে আর্মিরা একযোগে দৌড় দিল। আর্মিরা আক্রমণ করছে ভেবে ভীত সন্ ন্ত ছাত্ররা উল্টোপাল্টা দৌড়াতে শুরু করে। আর সাথে সাথে দুদিক থেকে ওৎ পেতে থাকা পুলিশ ছাত্রদের উপর হামলে পড়ে। আমি মুহ র্তেই পুলিশকে লক্ষ করে দোয়েল চত্বরের দিকে দৌড় দিই। কয়েকজন পুলিশের গা ঘেঁষে তাদের ছাড়িয়ে গেলাম। পরে সায়েন্স লাইব্রেরির গেটের মোটা খিলানের আড়ালে দাঁড়িয়ে পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জ

দেখছিলাম। প্রায় দু আড়াইশ পুলিশ চারদিক থেকে আটকে পড়া ছাত্রদের উপর নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করছে। সামনে জিমনিসিয়াম পেছনে সায়েন্স লাইব্রেরির সীমানা প্রাচীর, ডানে আর বাঁয়ে পুলিশ, ছাত্ররা আতঙ্কিত হযে যে যার মতো করে ছুটছে, কেউ কেউ পুলিশের বেদম প্রহার সহ্য করতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে আবার উঠে দৌড়াে ছ। মিনিট দশেকের মধ্যে পুরো জায়গা ফাঁকা হয়ে যায়, পুলিশ ছাত্রদের পিছু পিছু শহীদ মিনারের সামনের দিকে এগোয়। রাস্ ার উপর ছাত্রদের জুতাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। আমার নজরে পড়ল কেউ একজন মাটিতে পড়ে আছে। আমি তাকে লক্ষ করে ছুটে গেলাম। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লোকটাকে উল্টে দেখি ডালিম ভাই। প্রায় অচেতন, আমি তাকে কাঁধে তুলে ঢাকা মেডিকেলের ইমার্জেন্সীতে নিয়ে যাই। ইমার্জেন্সীর একটা ওয়ার্ডে আহত ছাত্রদের ভিড়ে উপচে পড়েছে। কেউ কেউ মারাত্মক জখম নিয়ে মাটিতে পড়ে কাতরাে ছ। ডালিমের অবস্থাও তখন খুব খারাপ। দুবার রক্ত বমি করেছে। একজন ডাক্তার ডেকে এনে ডালিমের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আমি তার বাসায় ফোন করে তার অবস্থা জানাই। এরপর কুসুম আপাকে ফোন করে জানতে পাই তারা হলে। সে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেলে আহত আজিজ রাসেলসহ অন্যান্যদের খোঁজ নিতে বলে। আমি ডালিমের সাথে হাসপাতালেই রয়ে যাই। এক সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল একজন ছাত্র নাকি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি কিনা। আমি অস্থির হয়ে মেডিকেল কলেজে এ ব্যাপারে খোঁজ নি ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে মনে হলো এটা গুজব। বেশ কিছু সময় পর ভারপ্রাপ্ত ভিসি আ.ফ.ম. ইউসুফ হায়দার, প্রক্টর আ.কা. ঢিরোজ আহমেদ, উপরেজিস্ট্রার শাহজাহান হাওলাদার আহত ছাত্রদের দেখতে এলে ঢাকা মেডিকেলে গেটে উপস্থিত ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। পুলিশ মেডিকেল গেটে লাঠিচার্জ শুরু করে। প্রো-ভিসি লাঠিচার্জ থামাতে বললে পুলিশ তার উপরও চড়াও হয়। তার যাওয়ার আধঘণ্টা পরে ঢাকা মেডিকেলে আসেন সেনাবাহিনী চীফ অফ স্টাফ মেজর জেনারেল ইবনে সিনা জামানী এবং ৪৬ পদাতিক ডিভিশনের প্রধান বিগ্রেডিয়ার জেনারেল হাকিম। সেখানে উপস্থিত ছাত্র ও সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন আহত ছাত্ররা আমাদের সন্ ান। ঘটনায় জড়িতে সেনা সদস্যরা দোষী প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্ি প্রদান করা হবে ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেনা ক্যাম্ প্রত্যাহার করা হবে।

তার চলে যাওয়ার পরে ২০ মিনিট আমি হাসপাতাল ছাড়ার সিদ্ধান্ নিই। তখন আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। কিছু খাবার গ্রহণ করার জন্য চানখাঁর পুলের দিকে এগিয়ে যাই। চানখাঁর পুলে তখন শহীদুল-াহ হলের ছাত্রদের সাথে পুলিশের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে শুনতে পেলাম বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা শহীদুল-াহ হলের সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলেছে ও চানখাঁর পুল পুলিশ বক্সে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ছেলেরা মিছিল নিয়ে মেডিকেলের দিকে রওনা হলে পুলিশ টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। আমি সেখানে আর অবস্থান না করে স র্যসেন হলের দিকে এগিয়ে এলাম। মেডিকেলে থাকা অবস্থায় উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছ থেকে নানারকম খবর পা ছিলাম। এক সাংবাদিক জানায়ড়মোকাররম ভবনে জিমনিসিয়াম গেট থেকে প্রায় ৫০ জন ছাত্রকে ধরে নিয়ে মোকাররম ভবনে আটকে রাখা হয়। আমি হলে ফেরার পথে ইউনিভার্সিটি মেডিকেলের সামনে গিয়ে তাদের খোঁজ নিলে জানতে পারি, এদের সবাইকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। হলে যাবার পথে পুলিশ দুবার আমার পথরোধ করে ও তারপর ছেড়ে দেয়। পথে

কোনো জনমানুষ নেই। কেবল পুলিশ আর পুলিশ। মাথায় কিছুই খেলছে না। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা। আমি লাইব্রেরির গেট দিয়ে প্রবেশ করে লেকচার থিয়েটার, বিজনেস ফ্যাকাল্টির দেয়াল ঘেঁষে সূর্যসেন হলে গেলাম। ঘড়িতে তখন সোয়া একটা।

হলে গিয়ে জানতে পারি জিমনিসিয়ামের সংঘর্ষের পর পুলিশ ছাত্রদের ধাওয়া করে হলে এসে হামলা করে ও হলের বাইরে অবস্থান নিয়ে বিপুল পরিমাণ রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল ছুড়তে শুরু করে। এ সময় হল থেকে তিন ছাত্রকে ধরে নেয়ার খবর রটলে হলের সব ছাত্ররা একসাথে নিচে নেমে এসে পুলিশদের পাল্টা ধাওয়া করলে মল চত্বরের অপরপাশে পুলিশ অবস্থান নেয়। একদিকে টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট পুলিশ অন্যদিকে বিস্তর ইট স্তূপ করে ছাত্ররা অবস্থান নিয়েছে। মল চত্বরে অবস্থান নেয়া পুলিশকে লক্ষ করে ইট ছুড়ছে। পুলিশ একটু পিছিয়ে গিয়ে থেমে থেমে টিয়ার শেল ছুড়ছে। ছাত্ররা বাগানের বেড়া, লেপ, তোষক, টায়ার, কাগজ সহ বিভিন্ন দাহ্য বস্তু স্তূপ করছে। তিন চার জায়গায় অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে টিয়ার শেলের প্রতিষোধক তৈরি করছে। সবাই হয় ইট কুড়ানো নয় ইট ছোড়ায় অথবা চোখ মুছতে ব্যস্ত। প্রাণপণ শক্তি দিয়ে ইট তুলে নিয়ে ছাত্ররা পুলিশের দিকে ছুড়ছে একটা ঢিলও পুলিশ অবধি পৌঁছুচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল করার সময়ও তাদের হাতে নেই। পুলিশকে উদ্দেশ্য করে অবিরাম খিস্তি খেউড় চলছে, কখনো ছোট ছোট দল বেঁধে ইট ছুড়তে মাঠের মাঝ পর্যন্ত গিয়ে আবার পুলিশের টিয়ার শেল আর রাবার বুলেটের তাড়া খেয়ে ফিরে আসছে। পুলিশ ও থেমে নেই। বৃষ্টির মতো ছুটে আসছে টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট। কোত্থেকে যেন একদল পথশিশু এসে যোগ দিয়েছে আমাদের সাথে। ওরা টিয়ার শেল মাটিতে পড়ামাত্র অসীম সাহসে তুলে নিয়ে পাল্টা ছুড়ে মারছিল। এর মাঝেই সূর্যসেন হলের একদল ছাত্রদল কর্মী টিন হাতে রেজিস্ট্রার ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি পোড়াতে যাচ্ছিল। আমরা কয়েকজন এগিয়ে গিয়ে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমাদের শত্রু নয় বুঝিয়ে নিবৃত করলাম। সে রাতে মাঠে কারা ছিল না, ডানপন্থী-বামপন্থী, ছাত্রদল-ছাত্রলীগ এমনকি ঘরকুনো-ক্যারিয়ারিস্ট সব ছেলেরা এসে একত্রিত হয়েছিল। পুলিশি বর্বরতার জবাব দিতে তারা সবাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। আমি ঘুরছি ফিরছি আর ভাবছি এরপর কী, এরপর কী? ঘড়িতে তখন প্রায় ২:৩০ বাজে। কালকের দিনের জন্য কিছু শক্তি সঞ্চয় করা দরকার ভেবে আমি রুমের দিকে এগুলাম।

২১ আগস্ট : বারুদগন্ধী শরৎ সকাল

২১ তারিখ ভোরবেলা প্রিয়ম পালের ডাকে ঘুম ভাঙ্গে। হল গেট দিয়ে বেরুবার সময় হলের সামনে পরিচিত ছেলেদের একটা জটলা চোখে পড়ে। আমরা জটলার মাঝে মিশে গেলাম। গতরাতের পরিস্থিতি নিয়ে কথা হচ্ছিল। শুনতে পেলাম গত রাতে ১২:৩০ টার দিকে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে একটি গোয়েন্দা সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পরিচয় গোপন করে ছাত্রদের সাথে কথা বলতে গেলে ছাত্ররা তাকে ধওয়া করে ও অপর এক গোয়েন্দা সংস্থার মাঠ কর্মকর্তাকে মারধর করেছে। তারা কোনোমতে দৌড়ে গাড়িতে উঠে পালাতে সক্ষম হয়। এই কথাটা উপস্থিত ছাত্রদের বেশ অনুপ্রাণিত করে। আমি জটলার মাঝে দাঁড়িয়ে পোগান ধরতেই তা দ্বিগুণ প্রতিফলন তুলে আমার কানে ফিরে এল। সূর্যসেন হলের গেট থেকে আমরা মিছিল নিয়ে এগুলাম। জসীম উদ্দীন হলের মোড় থেকে একদল ছেলে এসে আমাদের সাথে যোগ দিল। মিছিল নিয়ে আমরা অপরাজেয়

বাংলার দিকে এগুলোম। অপরাজেয় বাংলার সামনে আমরা জটলা পাকিয়ে কথা বলছিলাম আর শিক্ষকদের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সেদিন সকালবেলায় ছাত্রদের দাবির প্রতি সংহতি জানিয়ে শিক্ষক সমিতি অপরাজেয় বাংলা থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত পদযাত্রা ও কালো ব্যাজ ধরণ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছিলেন। ওখানে কমল ভাইয়ের সাথে দেখা। তাকে মুজিব, রাসেলদের বন্ধু হিসেবে চিনতাম। এর মাঝে এখানে-ওখানে ফিল্ম দেখতে গিয়ে বেশ কয়েকবার দেখাও হয়েছে। পরিচয় বলতে এতটুকুই, কমল ভাই কিছু লিফলেট ধরিয়ে দিলেন। 'উপদেষ্টাগিরি উড়িয়ে দাও, ভাড়াটেগিরি খামোশ কর' লিফলেটের শিরোনামে বড় বড় কালো হরফে লেখা। লিফলেটের সারাংশ ছিল :

বাংলাদেশ এক বিশেষ রাজনৈতিক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। সাম্রাজ্যবাদী নব্য উদারনীতিবাদী প্রথম বিশ্ব দীর্ঘ সময় ধরে দুর্নীতি, দারিদ্র্য, মৌলবাদ-জঙ্গিবাদকে ইস্যু করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের একটি নেতিবাচক ভাবমূর্তি নির্মাণ করেছে। তারপর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং প্রশাসন ও অর্থনীতিতে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাজনিত নৈরাজ্যের সুযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বব্যাংকের স্বার্থরক্ষা কাজে নিয়োজিত একদল আমলা এবং দালাল গণমাধ্যম ও মেরুদণ্ডহীন পরনির্ভরশীল সুশীল সমাজের একাংশকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন এই সরকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বকে বিকিয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতির স্বার্থানুকুলীন একটি ফ্রি অর্থনৈতিক জোন হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ। সেই সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটা ভাড়াটে বাহিনী যারা দেশে জনগণের ন্যায্য আন্দোলন দমন ও বিদেশে বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থরক্ষার কাজে ভাড়া খাটছে। এই মুহূর্তে সেনাবাহিনী জরুরি অবস্থা জারির ভিতর দিয়ে দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে বহুজাতিক কোম্পানি সমূহের স্বার্থানুকুলে পুনঃসংগঠিত করার মিশনে ব্যস্ত। দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অরাজকতার সুযোগে বিরাজনীতিকরণ ও শুদ্ধিকরনের আড়ালে এবার সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করছে। তারা এ সরকারকে দিয়ে এমন সব আইন প্রণয়ন ও বহুপাক্ষিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করাচ্ছে যা দীর্ঘ মেয়াদে জনস্বার্থের হানি ঘটাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও ছাত্রদের প্রবণতার মূল্যায়ন ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনা ছাউনি নির্মাণ ছাত্রদের উপর নজরদারির অপচেষ্টা মাত্র। গতরাত্রের ঘটনা প্রমাণ করে সেনবাহিনী ও সরকার যখন ছাত্রদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মর্যাদাবোধের উপর আঘাত করেছে এবং স্পষ্টতই বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়ত্তশাসন লঙ্ঘন করেছে। ছাত্ররা এর ন্যায্য প্রতিবাদ করলে যেভাবে পুলিশ বর্বর ও পাশবিক কায়দায় ছাত্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ন্যায্য বিচার হতে হবে। ছাত্রদের দাবির মতো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেনাবাহিনীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্যাম্প প্রত্যাহার করতে হবে ও সেনাপ্রধানকে ক্ষমা চাইতে হবে। অবিলম্বে জনগণের রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।"

এক নিঃশ্বাসে লিফলেটটা পড়ে মনে হলো এমন কিছুই চাচ্ছিলাম। আমার প্রাণ জলের ছোয়া পেল এবং আমি নিজের জন্য একটা কাজ পেলাম। কমল ভাইকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করেই আমি ও প্রিয়ম লিফলেট হাতে ছুটলাম।

ততক্ষণে ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে একটা মিছিল এল, তাদের পিছু পিছু রোকেয়া হল ও সামসুন্নাহার হল থেকে আরো দুটি মিছিল এল। সেখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষে একটা মিছিল অপরাজেয় বাংলা ত্যাগ করে যায়। আর বাকিরা শিক্ষকদের জটলার আশেপাশে

অবস্থান নেয়। ততক্ষণে একজন দুইজন করে প্রায় শখানেক শিক্ষক এসে জড়ো হয়েছেন। আমি লিফলেট নিয়ে শিক্ষকদের জটলায় প্রবেশ করলাম। দুরু দুরু বুকে প্রথম লিফলেটটা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক নাদির জুনায়েদের হাতে তুলে দিতেই আমার দ্বিধাভাব কেটে যায়। মিনিট দশেকের মাঝে সব লিফলেট শেষ হয়ে গেল। আমরা শিক্ষকদের অনুসরণ করে এগুতে লাগলাম। মিছিল রাজু ভাস্কর্য পৌঁছানোর পর আমি পোগান তুলে মিছিলের মৌনতা ভাঙার চেষ্টা করতেই দর্শন বিভাগের মতিউর রহমান স্যার পিছন ফিরে ঠোঁটে আঙুল রেখে মুচকি হাসি দিলেন। আমার মনে পড়ল এটা মৌন মিছিল। আমি আমার পকেটে থাকা শেষ লিফলেটটা তার হাতে তুলে দিয়ে শিক্ষকদের মিছিল ত্যাগ করে শাহবাগের দিকে এগুলাম। এসে দেখি মসজিদের গেটের সামনের রাস্তায় ছাত্ররা আর চারুকলার সামনে শদুয়েক পুলিশ সুসজ্জিত অবস্থায় জল কামান নিয়ে অবস্থান নিয়েছে। ওখানে গিয়ে শুনতে পেলাম এক পুলিশ ছিল ছুড়ে এক ছাত্রের মাথা ফাটাবার পর সংঘাত শুরু হয় এবং ছাত্রদের ঢিল ছোড়া বেড়ে গেলে পুলিশ কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে পাবলিক লাইব্রেরির সামনে অবস্থান নেয়। ততক্ষণে একদল ছাত্র শহীদ মিনার হতে ফিরে এসে খবর দিল সেখানেও শিক্ষকদের কর্মসূচিতে ব্যাপক লাঠিচার্জ করেছে। এরা এসে যোগ দেয়ার পর ঢিল ছোড়াছুড়ির হার আরো বেড়ে গেল। পুলিশও বেশুমারে রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে এসে ছাত্রছাত্রীদের ধাওয়া করে চারুকলা অনুষদে তুলল এবং অনুষদের সীমানা প্রাচীরের ভেতর টিয়ার শেল ছুড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পর প্রায় শখানিক সুসজ্জিত দাঙ্গা পুলিশ অনুষদের ভিতরে প্রবেশ করে একতলা, দোতলা ও পুকুরপাড়ে অবস্থানরত ছাত্রদের বেদম প্রহার শুরু করে। বিপুল সংখ্যক টিয়ার শেলের বিস্ফোরণের ফলে ঘটনাস্থল ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে কেউ চোখ খুলতেই পারছিল না। অবরুদ্ধ অবস্থায় পুলিশের বেদম প্রহার ও বুটের লাথিতে মেয়েদের হাহাকার আর্তনাদে পুরো এলাকায় নারকীয় পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এর মাঝেই রক্তাক্ত ও গুরুতর আহত ছাত্রদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আমরা দ্বিগুণ ক্রোধে পুকুরপাড় থেকে পুলিশের দিকে ইট ছুড়ছিলাম। আধ ঘণ্টা পর পুলিশ চারুকলা থেকে বেরিয়ে গেলে আমরা টিএসসির দিকে এগুলাম। টিএসসিতে তখন থেমে থেমে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ চলছে। রোকেয়া হলের সামনে অবস্থানরত মেয়েদের লক্ষ করে পুলিশ টিয়ার শেল ছুড়ছিল। মেয়েরাও ওখান থেকে এগিয়ে এসে পুলিশকে পাল্টা ঢিল ছুড়ছিল। আমরা পুলিশের ধাওয়া খেয়ে লাইব্রেরি গেট দিয়ে ঢুকে হাকিম চত্বরে অবস্থান নিলাম। সকাল থেকে তাড়ার উপর আছি। হাকিমে এসে দাঁড়ানোর কিছুক্ষণের মাঝে টের পেলাম লিফলেটটা বেশ কাজ দিচ্ছে। এর মাঝে বেশকিছু পরিচিত অপরিচিত ছেলের সাথে কথা হলো। এদের বেশিরভাগ সাধারণ ছাত্র। ঘটনার আকস্মিকতা ও প্রবলতা যাদের হতবিহ্বল করে দিয়েছিল। পুলিশের আগ্রাসী ভঙ্গি, দমন পীড়ন ও ছাত্রের মর্যাদাবোধে আঘাতের প্রতিরোধ করতে এরা পথে নেমে এসেছে।

শিক্ষকদের পদযাত্রা ও সমাবেশ দ্বারা এরা বেশ অনুপ্রাণিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যখন পথে নেমে এল, ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রতিরোধ তখন একরকম ন্যায্যতা পেল। ছাত্ররা নিশ্চিত হলো তারা ভুল কিছু করছে না। আমরা ছোট ছোট মিছিল নিয়ে লাইব্রেরি থেকে শহীদ বুদ্ধিজীবী চত্বর, বুদ্ধিজীবী চত্বর থেকে অপরাজেয় বাংলা, অপরাজেয় বাংলা থেকে চারুকলা প্রদক্ষিণ করছিলাম। মিছিলের পোগান শুনে সাধারণ ছাত্ররা এসে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে। এর মাঝে নানারকম খবর আসছে। জগন্নাথ কলেজের সামনে

ইংলিশ রোডে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ চলছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আরিচা রোড অবরুদ্ধ করে রেখেছে, ঢাকা কলেজের ছেলেরা ও হকাররা নীলক্ষেত-নিউমার্কেটের সামনে ভাংচুর চালিয়েছে ও সেখানে সংঘর্ষ চলছে। এসব খবর সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ধরে রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিল।

দুপুরবেলা চিন্তা পাঠচক্রের কমল, রোমেল ও জহিরের সাথে দেখা হয় বুদ্ধিজীবী চত্বরে। তখনো এদের সাথে আমার তেমন কোনো জানাশোনা ছিল না। তাদের সাথে মিনিট দশেক কাটিয়ে ঢাকা কলেজের দিকে এগোলাম। এফ রহমান হলের সামনে গিয়ে দেখি তুলকালাম কান্ড। সেখানে শদুয়েক ছাত্রদের অবস্থান লক্ষ করে বৃষ্টির মতো রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল ছুটে আসছে। এফ রহমান হলের সামনে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা মতভেদ ভুলে একত্রে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। পাশাপাশি স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্রদের বড় একটা অংশ। সেখানে বেশ কিছু বামপন্থীর সাথেও দেখা হয়। তারা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষতি না করার পণ করে আশপাশে ঘুরঘুর করছে। পুলিশ নীলক্ষেত মোড়ে অবস্থান নিয়েছে। নিউমার্কেটের ওদিক থেকে ঢাকা কলেজের ছাত্ররা এগিয়ে আসলে পুলিশ উল্টোদিকে দৌড়াল। এই সুযোগে এফ রহমান হলের সামনে অবস্থান নেয়া ছাত্ররা এগিয়ে গিয়ে এফ রহমান হলের পাশে অবস্থিত পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে বসে। আবার পুলিশ ফিরে এসে তাদের ধাওয়া করলে ছাত্ররা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। ঢাকা কলেজ যাবার সুযোগ নেই বুঝে আমরা মধুর কেন্টিনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এখানে এসে দেখলাম বাইরের এককোণে প্রপদের কিছু ছেলে (যাদের একজন পরবর্তীতে নিজেকে এ আন্দোলনের মহানায়ক দাবি করে প্রবন্ধ ছেপেছে) বাইরের দিকে বসে তত্ত্বের তুমুল ঝড় তুলছে। আন্দোলনের দুইদিন তিনরাতে এদেরকে আমি মধু ছাড়া আর কোথাও প্রতিরোধে অংশ নিতে দেখিনি।

ভিতরে ঢুকে দেখি অসংখ্য ক্যামেরা হাতে সাংবাদিকরা ভিড় জমিয়েছে ও অন্যদিকে সংবাদ সম্মেলনের জন্য চেয়ার টেবিল প্রস্তুত করা হচ্ছে। নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দের ব্যানারে সংবাদ সম্মেলন হবে। আর প্রগতিশীল ছাত্রজোট, প্রপদসহ অন্যান্য বামপন্থী সংগঠনগুলো মিলিতভাবে সংবাদ সম্মেলনের দাবি-দাওয়া তৈরি করেছে। আমি সংবাদ সম্মেলনের টেবিলের পাশে একটা টেবিলে বসে সংবাদ সম্মেলনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এক পরিচিত সাংবাদিকের কাছে রাজশাহীর সংঘর্ষের সংবাদ শুনছিলাম। তখন লুবনা আপা, আরিফ ভাই, নান্টু দা, বিপ-ব মন্ডলসহ অন্যান্য বামপন্থী নেতারা মধুতে প্রবেশ করে। সংবাদ সম্মেলন শুরু হওয়া মাত্রই ছাত্রলীগের একটা গ্রুপ এসে হৈচৈ শুরু করে ও সংবাদ সম্মেলনের টেবিলের উপর উঠে দাঁড়ায়। মুহূর্তেই ছাত্রনেতারা টেবিল থেকে উঠে মধু ত্যাগ করল। আমি উঠে গিয়ে মেঝে থেকে প্রেস রিলিজের কপিটা হাতে তুলে নিলাম। প্রথম দলটা বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর ছাত্রইউনিয়নের একটা গ্রুপ মধুতে প্রবেশ করে এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের সংবাদ সম্মেলনে আহ্বান করে। ঘটনার বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে আমিও তাদের সাথে যোগ দিই। শুভ ভাই এসে টেবিলে বসার পর আমি তার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে টেবিলের উপর প্রেস রিলিজের কপিটা দুহাতে চেপে ধরলাম। শুভ ভাই প্রেস রিলিজ পড়ে সংবাদ সম্মেলন শেষ করলেন। তারা সংবাদ সম্মেলন শেষ করার পর আমি বেরিয়ে এলে সংবাদ সম্মেলন পন্ড করার কারণ ও ইউনিয়নের ভূমিকা শুনে থ হয়ে গিয়েছিলাম। এবং এই ব্যানারের বাইরে সংগঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। বিকাল তিনটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেনা ক্যাম্প সরানো হচ্ছে এরকম গুজব রটালে সংঘাত কিছুটা

স্মিত হয়ে আসে। আমরা নিশ্চিত হওয়ার জন্য সাড়ে চারটার দিকে মেডিকেল গেটে গেলাম। ওখানে গিয়ে শুনতে পেলাম রেলওয়ে হাসপাতালের সামনে ফজলুল হক ও একুশে হলের ছাত্ররা পুলিশের একটা পিকআপসহ বেশ কিছু গাড়ি ভাংচুর করেছে ও বিআরটিসির একটা বাসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

ওখান থেকে ফেরার পথে টিএসসির কাছে চিৎকার পাঠচক্রের লোকজনের সাথে আবার দেখা। আমরা ২২ তারিখ দুপুরবেলায় মধুর পিছনে ঘটনা নিয়ে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়ে মধুর দিকে এগোলাম। মধুতে এসে শুনতে পেলাম সাড়ে পাঁচটার দিকে সংঘাত স্মিত হওয়ার পর নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ির সামনে পুলিশ এক ছাত্রকে ধরে পিটিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করার পর আবার নীলক্ষেতে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। আমরা আবার নীলক্ষেতের দিকে ছুটলাম। সেখানে যাওয়ার পথে পেট্রোল ভর্তি কাচের বোতল হাতে সাংবাদিক বিভাগের জুয়েলের সাথে দেখা হয় এবং তার কাছ থেকে খবর পেলাম ফজিলাতুন্নেসা ও কুয়েত মৈত্রী হলের ছাত্রীরা বিক্ষোভে অংশ নিতে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে পুলিশ সেখানে ব্যাপক টিয়ার চার্জ করে। এফ রহমান হলের সামনে থেকে সাড়ে আটটার দিকে মধুতে আসি পরের দিনের বৈঠকের প্রস্তুতি ও যোগাযোগ কাজ করার উদ্দেশ্যে মধুতে এসে জানতে পারি ২২ তারিখ 'নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ' ও ছাত্রলীগ সারাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস বর্জন ও ধর্মঘটের আহ্বান করেছে। ছাত্রদলও এ কর্মসূচিতে সমর্থন জানিয়েছে। রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ঘুরে ঘুরে ছাত্রছাত্রীদের সাথে বিক্ষোভ কিভাবে চালিয়ে নেয়া যায় সে ব্যাপারে শলাপরামর্শ করে সময় কাটিয়ে পরে হলে ফিরে এলাম।

বালিয়াড়ি বিকাল

তৃতীয় দিনেও ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ থেমে থেমে চলছিল। চারুকলায় দ্বিতীয় দিনের তাণ্ডবের পর ছাত্রদের ছোট ছোট মিছিলগুলো টিএসসি পর্যন্ত এসে থেমে যাচ্ছিল। বুদ্ধিজীবী চত্বরে শিক্ষক সমিতির একটা অংশ এসে সকাল সাড়ে দশটার দিকে ছাত্রদের সাথে মত বিনিময় করে যায়। এ সময় দেখলাম ছাত্রদের একটা গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পরিত্যক্ত পিকআপ ভ্যান নিয়ে ভিসির বাসভবনের গেটে আঘাত করছে। কিছুক্ষণ পর সে পিকআপ ভ্যানটাতে আগুন জ্বালানো হলো। আমরা দুবার মিছিল করে শাহবাগের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে টিএসসিতেই পুলিশের ধাওয়া খেয়ে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে মধুতে এলে সাংবাদিকতা বিভাগের এক পরিচিত ছেলে ৪ পাতার একটা পত্রিকা হাতে ধরিয়ে দেয়'গণরায়', সম্পাদক বাংলাবাজার পত্রিকার ক্যাম্পাস রিপোর্টার খোমেনী ইহসান। প্রথম দিনের বিক্ষোভে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তার আহত হওয়ার খবর পেয়েছিলাম। তার সাথে বিগত জানুয়ারি মাসে নৈশকোর্স বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে পরিচয় হয়। আমাদের বক্তব্যের সাথে তার বিশে-ষণের যথেষ্ট মিল রয়েছে দেখে স্বস্তি পেলাম।

শাহবাগে কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউতে ভাংচুর চালালে সারা শহর অচল হয়ে পড়বে। এই চিন্তা থেকে আমরা ১০-১২ জন শাহবাগের দিকে এগোলাম। সামনে অবস্থানরত পুলিশ আমাদের লক্ষ করে টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করা শুরু করে। আমরা একটু পিছিয়ে এসে টিএসসি থেকে আরো ছাত্রদের ডাকার উদ্দেশ্যে দৌড়াতে শুরু করলাম। দৌড়ানোর সময় আমরা শাহবাগে পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলি

চালিয়েছে বলে চেঁচাচ্ছিলাম। খবরটা মুহূর্তেই চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। মসজিদ গেটের সামনে অবস্থান নেয়া ছাত্ররা প্রথম শাহবাগের উদ্দেশ্যে দৌড় দিল। তার সাথে তাদের পিছু পিছু টিএসসির মোড় থেকে আরো শখানেক ছেলে ছুটতে লাগল। আমি খবরটা রটানোর জন্য টিএসসি পর্যন্ত গিয়েছিলাম। তারপর আবার উল্টো ঘুরে শাহবাগের দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। শাহবাগে গিয়ে বুঝলাম জনতা আবার পথভ্রান্ত। ছাত্ররা শাহবাগ থানার সামনে অবস্থানে নেয়া পুলিশের ধাওয়া খেয়ে বারডেমের দিকে না গিয়ে আজিজ মার্কেটের দিকে দৌড়াচ্ছে। পায়ে আঘাত লাগায় আমি জাদুঘরের সামনে মিনিট পাঁচেক জিরোলাম। তারপরে আজিজের দিকে এগুলাম। পথে ভাঙাচোরা গাড়িগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ভাংচুর চালাতে চালাতে ছাত্ররা কাঁটাবন হয়ে ক্যাম্পাসের দিকে এগোচ্ছে। আজিজ মার্কেটের সামনে একটা জায়গায় রক্তের চিহ্ন তার সামনে একটা কাচভাঙা গাড়ি। এটাই ছিল সেনা কর্মকর্তার সেই গাড়ি। আমি পিছনে তাকিয়ে দেখি আরেক দল পুলিশ আসছে। রাস্তা পার হওয়ার সময় দেখলাম একজন চুলছাঁটা সামরিক ফিগারের মানুষ পত্রিকায় আগুন ধরিয়ে গাড়ির ভিতরে ছুড়ে দিচ্ছে। উপস্থিত সাংবাদিকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে। রাস্তার ওপারে জাদুঘরের সীমানা প্রাচীরের লাগোয়া গেট দিয়ে ঢুকে একটা অফিসের দোতলায় উঠে এসে আমি জিরোচ্ছিলাম। প্রায় বিশ মিনিট পর রাস্তায় আগুনের কুণ্ডলি চোখে পড়ল। আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখি প্রাইভেট কারটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। আমি দেয়াল টপকে মুজিব হল হয়ে ক্যাম্পাসে ফিরার পথে প্রিয়ম পালের সাথে হলের সামনে দেখা হয়। ভাংচুরের ধকল কাটিয়ে দুপুরের পর আমরা বিক্ষোভের সময় নতুন করে পরিচিত হওয়া বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মধুর পিছনে আলোচনায় বসি। সেখানে তৌফিক, তুহিন, প্রিয়ম, রফিক, মুজিব, রাসেল, আযম, মাহাবুব, তানিয়া, সুমন, শোভন, কামাল, শিহাব, কমলভাই, মুন্নি, রনিসহ আরো প্রায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল। এছাড়া রোমেল, জহির, ফারুক ওয়াসিফ, ফারজানা ববিসহ বাইরের বেশ কিছু সাবেক ছাত্র ও সাংবাদিক উপস্থিত ছিল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যারা শহরের অপরাপর অংশে যে বিক্ষুব্ধ মানুষরা প্রতিরোধে নেমেছে তাদের সাথে যোগাযোগ করার উপায় বের করা ও কিভাবে এই প্রতিরোধে আরো বেশি মানুষকে জড়ো করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করে আমাদের আশু করণীয় নির্ধারণ করা। মোদ্দা কথা আমরা বিক্ষোভকে আরো প্রবলমাত্রায় সারা শহরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম। দুদিনের পর্যবেক্ষণে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে নানা শ্রেণির মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা থেকে বিক্ষোভে অংশ নিচ্ছে। তবু ওই মুহূর্তে পুলিশও প্রশাসনের অতি আগ্রাসী ভূমিকা আমাদের এতটা তাতিয়ে দিয়েছিল যে আমরা সরকারের উপর বিন্দুমাত্র আস্থা রাখতে পারছিলাম না। আমরা সারাদেশ ব্যাপী তুমুল নৈরাজ্য সৃষ্টি করে সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে সেনাবাহিনীকে দর্পচ্যুত করতে চেয়েছিলাম। যদিও আমরা জানতাম না, সেনা সমর্থিত এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পদচ্যুত করলে কারা জাতির সামনে নেতৃত্ব হয়ে আসবে। তবে রাষ্ট্রের সমাজের সর্বত্র আইন-আদালত ও যৌথবাহিনীকে কাজে লাগিয়ে বিরাজনীতিকরণের যে গণবিরোধী খেলায় সরকার মেতেছিল তার সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমাদের রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে বাঁচানোর একটা সুযোগ এসেছে। এই সুযোগকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছিলাম আমরা। স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ও আন্দোলন একটা প্রবলমাত্রায় কিছুদিন টানা প্রতিরোধ গড়তে পারলে ওই আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব

উঠে আসবে। আমাদের মনে এ ব্যাপারে বিন্দু বিন্দু আশা সঞ্চার হি ছল। এর মাঝে ক্যাম্ াস বন্ধ হে ছ বলে গুজব ছড়ায়। সাড়ে পাঁচটার দিকে গুজবকে সত্যি করে দেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরে কারফিউ জারি করা হয় এবং সাড়ে আটটার মধ্যে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় হল ফাঁকা করার নির্দেশ দেয়া হয়। এছাড়া দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহানগর অঞ্চলে অবস্থিত কলেজগুলোকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ক্যাম্ াসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাইকিং শুনে আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হই। তৎক্ষণাৎ ক্যাম্ াস না ছেড়ে কি করা যায় তা ভাবছিলাম। আমরা স র্যসেন হলের দিকে যাওয়ার পথে চোখে পড়ল দলে দলে ছেলেরা ব্যাগ গুছিয়ে হল ছাড়ছে। হলগেটে পৌঁছে দেখি ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সাধারণ ছাত্রদের হল ত্যাগ না-করার অনুরোধ জানাে ছ। ওখানে খোমেনীও ছিল। আমরা ক্যাম্ াস না ছাড়ার শেষ চেষ্টা হিসেবে একটা মিছিল করার সিদ্ধান্ নিলাম এবং মিছিল নিয়ে পুরো ক্যাম্ াস প্রদক্ষিণ করলাম। আমাদের মিছিল যদিও ছাত্রদের হল ত্যাগে নিবৃত করতে পারেনি। তথাপি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার নৈতিক সাহস ধরে রাখার ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজে এসেছিল। মিছিল শেষ হতে সাড়ে ছয়টা বাজে। ততক্ষণে সব মোবাইল কোম্ ানির নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এদিকে আমার পকেটে কোনো টাকা নেই। দর্শন বিভাগের কামাল ভাই এগিয়ে এলেন, তার কাছ থেকে ২০০ টাকা পেয়ে আমি মুজিব, সুমন একসাথে রিকশাযোগে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ক্যাম্ াস ত্যাগ করলাম। নানা জল্পনা-কল্পনা করে রাতটা চিড়িয়াখানার কোয়ার্টারে সুমনের ভাইয়ের বাসায় কাটালাম।

বিপ-বের চুলকানি

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে জহিরের সাথে যোগাযোগ করে আমি ও সুমন মিরপুরে ইলিয়াস মিলন ভাইয়ের বাসার দিকে রওনা হলাম। ওখানে গিয়ে গৌতম দা, তরিকুল হুদা, মোহাম্মদ রোমেলকে পেলাম। সেখান থেকে আমরা রিকশা করে শ্যামলী উবিনীগে এলে ফরহাদ ভাইয়ের সাথে দেখা হয়। বিক্ষোভ চলাকালে ছাত্রজনতার ন্যায্য প্রতিবাদকে সমর্থন করে নয়াদিগন্েে তিনি একটি সাহসী কলাম লিখেছিলেন।

নানা কারণে এটা আমার জন্য অসম্ভব গুর্ত্বপ র্ণ কিছু ছিল। এর জন্য আমি অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। তিনদিন লাগাতার প্রতিরোধ ও বিক্ষোভ শেষে হতাশ হয়ে সবাই যখন ঘরে ফিরে যাে ছ তখন আমাদের কাছে এই প্রতিরোধের তাৎপর্য ও সম্ভাবনার জায়গাগুলো তিনি একে একে খোলাসা করলেন। আমরা আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার জন্য ঘটনাপ্রবাহের হালনাগাদ বিশে-ষণসহ আরেকটা লিফলেট প্রচারের সিদ্ধান্ নিলাম। লিফলেটের খসড়া করা হলে সুমন লিফলেট কম্ োজ করতে পল্টন ছুটল। সুমন ফিরে এলে সেটা ছাপানোর জন্য পুরনো ঢাকার বাবু ভাইকে ফোন করলাম। বাড়ির নিচে তাদের পুরনো প্রেস, কিন্তু কোনো কর্মচারী উপস্থিত না থাকায় তিনি নিজ খরচে সাড়ে তিনশ লিফলেট ফটোকপি করে দিলেন।

২৪ তারিখ ওই লিফলেট নিয়ে আমরা ক্যাম্ াসে আসি। ক্যাম্ াসে ঢোকার পথে সাংবাদিক রিয়াদ ভাইয়ের সাথে দেখা। তার কাছে শুনতে পেলাম ২৩ তারিখ সকাল ৯ টার দিকে পুলিশ ও সেনা সদস্যরা আজিজ মার্কেটের বিভিন্ন ফ্ল্যাটে অবস্থানরত ভাড়াটিয়াদের লাইনে দাঁড় করিয়ে বেদম প্রহার করেছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের নীলক্ষেত, আজিমপুর, চানখাঁরপুল, পরিবাগ, সেন্ট্রাল রোড, ধানমন্ডি ও

শঙ্করে অবস্থিত বিভিন্ন মেসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের খোঁজে তল-াশি চালিয়েছে এবং যেখানে ছাত্রদের পাে ছ বেধড়ক মারধর চালাে ছ। ২৩ তারিখ সাদা পোশাকের পুলিশ ও সেনা সদস্যরা স র্যসেন হল, মহসিন হলসহ বেশিরভাগ হলে ঢুকে তল-াশি চালিয়ে কোনো ছাত্রকে না পেয়ে কর্মচারীদের মরধর করে। এমনকি তারা শিববাড়ি আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করে ও ছাত্রদের খোঁজে কর্মচারীদের ঘরে ঘরে তল-াশি চালায়। রিয়াদ ভাইয়ের হাতে লিফলেটের প্রথম কপিটা তুলে দিলাম। ঘণ্টা দুয়েক ক্যাম্ াসে ঘুরে গোটা ত্রিশেক লিফলেট বিতরণ করলাম। ক্যাম্ াসে তখন সাংবাদিক ও বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের নেতারা ছাড়া কেউ ছিল না। যার সাথেই দেখা হি ছল সেই আমার ভিতর ভীতি জাগানোর চেষ্টা করছিল। সবার একই কথা এখানে কী করো, এসবের কোনো দরকার নেই। আর্মি-পুলিশ তোমাকে খুঁজছে, যে কোনো সময় গ্রেফতার হতে পারো। যতদ র সম্ভব পালাও। অথচ আমাদের মাথায় তখন অন্য নেশা ভর করেছে। আমাদের মনে তখন বিক্ষোভের রাজনৈতিক প্রণোদনাকে কাজে লাগিয়ে নতুন ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার স্বপ্ন। আমরা সিদ্ধান্ নিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু বন্ধ তাই অন্যান্য যে সব জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে সেসব জায়গায় যাব। প্রথমেই গা ঢাকা দেয়ার জন্য আমরা ময়মনসিংহ গেলাম। এক বন্ধুর নানা সিপিবি'র সাবেক জেলা সভাপতি আবদুল আজিজ সাহেবের বাসায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। সেখানে দুদিন থেকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু যোগাযোগ সেরে ঢাকায় ফিরলাম।

ঢাকায় এসে উঠলাম সুমনের বড় ভাইয়ের চিড়িয়াখানার কোয়ার্টারে। সেখানে দুদিন থেকে আশ্রয় নিলাম জহিরের দুয়ারিপাড়ার চিলেকোঠায়। সেখানে রাত্রি কাটাই আর দিনের বেলায় ঢাকা কলেজ, বুয়েট, জগন্নাথ কলেজসহ যেসব জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছিল ওই জায়গায় ঘুরে বেড়াই। লোকজনের সাথে কথা বলি। আসলে ২৩ তারিখের পর ঢাকায় বাস করা ছাত্রসমাজের নব্বই ভাগই (যারা কোনো-না-কোনোভাবে সংঘাত স্থলে ছিল) ঢাকা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। বিক্ষোভের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর প্রতিরোধের উদ্দীপনাকে নার্সিং করে কিভাবে একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নিয়ে যাওয়া যায় তাই আমাদের তখনকার একমাত্র চিন্ া। সে সময়টাতে কামাল, কমল, প্রিয়ম, কুসুম, সিফাত, তৌফিক, রনি, মুন্নী, কুসুমসহ আরো অনেকে আমরা নিয়মিত মিলিত হতাম শ্যামলীর উবিনীগে। যদিও সে সময় আমার পকেটে কোনো টাকা ছিল না। তথাপি আযম স্যার ও জহিরের কল্যাণে আমার দুবেলার আহার ঠিকই জুটে যেত। আমরা শ্যামলীর উবিনীগে একটা পাঠচক্র শুর্ করলাম।

আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে

সংঘাতের শুর্টা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হলেও তা মুহ র্তেই সারা শহর তথা সারাদেশে বিস্ ার লাভ করেছিল। ২১ তারিখ সকাল থেকে নীলক্ষেত ও নিউমার্কেটের সামনে ছাত্র ও জনতার যৌথ মহড়া চলছিল। ছাত্র ও হকারদের মিছিল শেষে সমাবেশে এক হকার নেতা প্রধান উপদেষ্টা ও সেনা প্রধানের পদত্যাগ দাবি করে বক্তব্য রাখে।

২১ তারিখ সকালবেলায় বুয়েটের শিক্ষার্থীরা ঢাবির ছাত্রদের সমর্থনে কালো ব্যাজ ধারণ করে মানববন্ধনে অংশ নেয়। ২১ তারিখ সায়েন্স ল্যাবের মোড়ে বিকালবেলায় পুলিশের সঙ্গে হকার ও ছাত্রদের সংঘর্ষ বাঁধে। মারমুখি জনতা সায়েন্স ল্যাব পুলিশ বক্সে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং গাড়িঘোড়ায় ভাংচুর চালায়। সেদিন গুলিস্থান, ফুলবাড়িয়া, বঙ্গবাজার,

রায়সাহেব বাজার, নয়া বাজার, সদরঘাট, ইংলিশ রোড, নবাবপুরে হাজারে হাজারে হকার, রিকশাঅলা ও শ্রমজীবী মানুষ পথে নেমে আসে। এদের সাথে জগন্নাথ কলেজ, কবি নজরুল কলেজ ও সোহরাওয়ার্দী কলেজের ছাত্ররা যোগ দেয়। তারা বেলা দুটার দিকে ডেসার অফিসে প্রবেশ করে সেখান থেকে দুটো গাড়ি, মোটর সাইকেল ও বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক তার বের করে রাস্তায় আগুন ধরায়।

পরিস্থিতি উত্তাল দেখে জর্জ কোর্টের সমস্ত কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। সেদিন পুরনো ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় চলন্ত গাড়িতে ব্যাপক ভাংচুর চলেছিল। ডিসি অফিস, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অনেক সরকারি দপ্তরও আক্রান্ত হয়েছিল। শঙ্করে বেশ কিছু গাড়িতে আগুন ধরানো হয়। কমলাপুরে বিআরটিসি ডাবল ডেকার ও মাইক্রোবাসে আগুন ধরানো হয়। মহাখালী ওয়ারলেস গেটে, তিতুমীর কলেজে দু-তিনশ ছেলে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। বেলা দশটার দিকে সিদ্ধেশ্বরী কলেজ, হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজ, আবুজর গিফারি কলেজের ছাত্ররা পথে নেমে এলে তাদের সাথে যোগ দেয় বিক্ষুব্ধ শ্রমজীবী জনতা। মুহূর্তেই শান্তি নগর, কাকরাইল, পুরনো পল্টন, মৌচাক রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তেজগাঁও কলেজ সংলগ্ন এলাকা ও মিরপুর বাংলা কলেজ সংলগ্ন এলাকায় দফায় দফায় পুলিশ-জনতা সংঘাত চলেছে। জাহাঙ্গীরনগরের ছাত্ররা সকাল থেকে ঢাকা-আরিচা সহাসড়কে বিক্ষোভ করে ও ৬ ঘণ্টা রাস্তা অবরুদ্ধ করে রাখে। চলি-শজনেরও বেশি শিক্ষক তাদের সাথে এসে সংহতি জানিয়ে যায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালন করতে সকাল ৯ টায় ছাত্ররা পথে নেমে আসার পর হতে দিনভর ছাত্র-পুলিশ সংঘাত চলে। ভিসি অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে ও বিকাল সাড়ে ৬ টার মধ্যে হল ফাঁকা করার নির্দেশ জারি করে।

খুলনা বিএল কলেজের ছাত্ররা পুলিশী সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন কালে ছাত্র-পুলিশ সংঘাত বাধে। ছাত্ররা পথে নেমে আসে ও ৫ ঘণ্টা খুলনা-যশোর হাইওয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষার্থীরা কালো ব্যাজ ধারণ করে ঢাবির ছাত্রদের সমর্থনে মানববন্ধন করে। খুলনা আযম খান ও মজিদ মেমোরিয়াল কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট পালনকালে রাস্তা ও দোকানপাটে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। ময়মনসিংহ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় ও সিলেটের শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও ধর্মঘট পালিত হয়। তেজগাঁও-ঘোড়াশাল রোড অবরুদ্ধ করে পবালী ডিগ্রী কলেজের শিক্ষার্থীরা ভাংচুর চালায়।

রাজশাহীতে ২২ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকায় চলা সংঘাতে ১ জন নিহিত ও ২০০ জন আহত হয়। সেদিন সকাল ৮:৩০ টায় ঢাবিতে পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে ছাত্ররা শান্তি পূর্ণ র‍্যালি বের করে। র‍্যালিতে পুলিশের হামলার সাথে সাথে সংঘর্ষ তৈরি হয়। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ ৪০০ রাউন্ড রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। পুলিশের ছোড়া অগুণতি টিয়ার শেলের ধোঁয়ায় পুরো ক্যাম্পাস ধোঁয়া ছন্ন হয়ে ওঠে। ছাত্ররা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ ফটক দখল করে নেয়। ঢাকা-রাজশাহী হাইওয়েতে গাছ ফেলে ও আগুন জ্বালিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়। পুলিশ পিছিয়ে কালিয়া গেটে অবস্থান নিয়ে আক্রমণ অব্যাহত রাখে। গণমাধ্যমের কাছে পুলিশ কর্মকর্তারা জানায় তারা ভিসির নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বেলা ১২ টার দিকে ভিসির বাসভবনের তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে ও ভাংচুর চালায়। ভিসির নির্দেশে ১০০ দাঙ্গা পুলিশ এসে বেশুমার রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস

নিক্ষেপ করতে করতে ভিসির বাসভবন পুনরুদ্ধার করে। এ সময় রাবার বুলেট বিদ্ধ এক ছাত্রকে রিকশা করে সরিয়ে নেয়ার সময় বুলেট বিদ্ধ হয় রিকশাচালক আনোয়ার। হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করে। ছত্রভঙ্গ ছাত্ররা জিমনিসিয়ামে অবস্থিত পুলিশ ক্যাম্প ভাংচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ছাত্ররা বিক্ষোভ থেকে ক্যাম্প াস থেকে পুলিশ প্রত্যহার ও জরুরি অবস্থা তুলে নেয়ার দাবি জানান।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাউফল ডিগ্রী কলেজের ছাত্ররা, কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সিরাজগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সিরাজগঞ্জের ইসলামিয়া ডিগ্রী করে, সেলেংগা ডিগ্রী কলে, গাইবান্ধা ডিগ্রী কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, সাতক্ষীরা গভঃ কলেজ, সাতক্ষীরা সিটি কলেজ ও ফরিদপুর ব্রজেন্দ্র কলেজের ছাত্ররা ঢাবির ছাত্রদের উপর পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ চলাকালে কলেজের আশপাশের রাস্তা ঘাট ও গাড়ি ঘোড়ায় ভাংচুর চালায়।

২১ তারিখ মধ্যরাতে অজ্ঞাতনামা একদল যুবক শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরীর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ করে ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে।

নির্বিচারে গ্রেফতার, টর্চার, মামলা, তথ্য অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ

কারফিউ জারির পর থেকেই র‍্যাব, সেনা, পুলিশ সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ও শিক্ষক পরিচয় পাওয়ামাত্র গ্রেপ্তার কিংবা মারধর শুরু করে। বাস স্টেশন, রেল স্টেশন, লঞ্চঘাট সর্বত্রই ঘরফেরত ছাত্রদের খোঁজে কড়া তল্লাশি শুরু হয়। বিক্ষোভ চলাকালে সাংবাদিকদের ক্যামেরা, চ্যানেলগুলোতে হানা দিয়ে ফুটেজ সংগ্রহ করে সেনা গোয়েন্দা সংস্থা। এমনকি ঘটান চলাকালে চ্যানেলগুলোতে ঘাপটি মেরে বসেছিল সেনা গোয়েন্দার সংস্থার লোকজন। সংঘাতে উস্কানি দেয়ার অভিযোগে চ্যানেল ও পত্রিকাগুলোতে পাঠানো হয় সতর্কবার্তা। একুশে টিভির সম্প্রচারে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় ও সিএসবি নিউজ চ্যানেল চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়। সংঘাত চলাকালে পুলিশি বর্বরতার শিকার হয় বহু সংবাদকর্মী। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সাথে সংঘাতের জের ধরে চলা পুলিশি বর্বরতার বিচার চেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকরা প্রেসক্লাব, রিপোর্টার্স ইউনিট, শাহবাগসহ শহরের বিভিন্ন ঘরোয়া সভা সেমিনার থেকে নিয়মিত বিবৃতি দিয়েছেন। মত প্রকাশের স্বাধীনতা তথা তথ্য অধিকারকে এভাবে সেনা পুলিশের টিয়ার শেল রাবার বুলেট ও বুটের তলায় পিষ্ট করার প্রতিবাদে তারা ঢাকা শহরে পরবর্তী সপ্তাহ নিয়মিত মানববন্ধন ও সেমিনার চালিয়ে গেছেন।

২৪ তারিখ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ও অধ্যাপক হারুনুর রশীদকে র‍্যাব সদস্যরা অজ্ঞাত স্থানে তুলে নিয়ে যায়। রাজশাহীতেও সাদা পোশাকের র‍্যাব সদস্যরা অধ্যাপক সাইদুর রহমান খান, অধ্যাপক আব্দুস সোবহান খান ও অধ্যাপক মলয় কুমার ভৌমিককে গ্রেফতার করে পাশাপাশি জরুরি অবস্থা ভঙ্গ, ভাংচুর ও নাশকতাম লক তৎপরতার অভিযোগে দুশো ছাত্রের নামে মামলা দায়ের করা হয়।

২৩ আগস্ট ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ছাত্রদল সভাপতি আজীজুল বারি হেলালকে গ্রেফতার করা হয়। ২৬ তারিখ সারাদেশে জরুরি অবস্থা ভঙ্গ, ভাংচুর ও নাশকতাম লক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ৭৬,০০০ হাজার ছাত্রকে আসামী করে ৩৫টি মামলা দায়ের করা হয়। পরবর্তীকালে ৩৪টিতে নেমে আসা এসব মামলায়

আসামী করা হয় ১২৫ জন ছাত্রকে। সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখের পূর্বেই ৫০ জনের অধিক ছাত্রকে শাহবাগ থানায় ও ৩০ জনকে নীলক্ষেত থানায় গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছিল। ১০ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক সদরুল আমিন, অধ্যাপক হারুনুর রশীদ, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিকসহ ৩২ জনকে আসামী করে ৪টি মামলার চার্জশীট জমা দেয়া হয়। ১৩ তারিখ এই ৪ জন অধ্যাপকসহ ছাত্রনেতা হাসান মামুন, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, কামরুল হাসান কচি, তানজীন চৌধুরী লিলি, অপর্ণা পাল, রিফাত হোসেন জিকু, শাহিনুর নার্গিস, নজরুল ইসলাম রাসেল, শামসুর কবির রাহাত, মিতুল, আজিজ, রোকনুজ্জামান, আনোয়ার হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, দীন ইসলামসহ ১৪ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। একই দিনে অধ্যাপক সদরুল আমিন ও অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর সদরুল আমিন ও ১৮ সেপ্টেম্বর নিমচন্দ্র ভৌমিক আদালতে আত্মসমর্পণ করলে তাদের জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়। শাহবাগ মোড়ে দায়ের করা মামলায় আসামী করা হয় ছাত্রলীগ সভাপতি সোহেল রানা টিপু, বাংলাবাজার পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক গোলাম আযম খোমেনী ও ছাত্রনেতা শামসুদ্দোজা সাজেনকে। ক্রমান্বয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ জন ছাত্র মানবেন্দ্রনাথ, জাহিদ ইসলাম, আসাদুজ্জামান, দীন ইসলাম, লিটন, দীন ইসলাম এঞ্জেল, রফিকুল ইসলাম সুজন ও মনিরুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের উপর টর্চার সেলে নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন।

রাজশাহীতে অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস, সেলিম রেজা নিউটন, আব্দুল্লাহ আল মামুনকে ছাত্রদের উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে মামলার আসামী করা হয়। তারা স্যারেন্ডার করলে তাদের জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গ্রেফতার, রিমান্ড তথা তাদের উপর শারীরিক লাঞ্ছনা ও মানসিক পীড়নের অভিযোগ গণমাধ্যমে উঠে আসতে থাকলে এটা নিয়ে মানবাধিকার সংস্থা ও সুশীল সমাজের বড় একটা অংশ উদ্বেগ প্রকাশ করে ও বেশ সরব হয়ে উঠেছিল।

প্রতিজ্ঞাপাশে প্রত্যাবর্তন : আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে সম্ভবত ২৩শে অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হলে আমি সূর্যসেন হলে এসে উঠি। শুরুর দিকে গ্রেফতারকৃত ছাত্র শিক্ষকদের ব্যাপারটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র আলোচনার বিষয় হয়ে উঠে। মধুর ক্যান্টিনের সংবাদ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ছাত্র ইউনিয়নের উপর বাকি সংগঠনগুলোর অবিশ্বাস, পুরনো মতভেদ, জরুরি অবস্থার অজুহাতে বাইরে, রাজপথে আন্দোলনের অনীহা, নৈরাজ্যভীতি ও তাদের ব্যাপারে সাধারণ ছাত্রদের নেতিবাচক ধ্যানধারণার কারণে আমরা আলাদাভাবে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছিলাম।

আমাদের প্রথম দুটো মানববন্ধনের ব্যানার ছিল “ছাত্রশিক্ষক মুক্তি আন্দোলন”। আমাদের সামনে দুটো লক্ষ্য ছিল ১। কঠোর ও কার্যকর কর্মসূচি নেয়ার ব্যাপারে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য প্রেসার গ্রুপ হিসেবে করাজ করা, ২। আন্দোলন থেকে নতুন ছাত্রসংগঠন তৈরি প্রক্রিয়া শুরু করা।

শিক্ষকদের গ্রেফতার ও টর্চার সেলে বীভৎস নির্যাতনের খবর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজে বেশ আড়োলন তুলেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম থেকে হাকিম চত্বর পর্যন্ত

গ্রেফতারকৃত ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি সমবেদনা ছন্ন হয়ে উঠে। এ ধরনের বড় বিক্ষোভ চাক্ষুষ দেখার বিরূপ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাওয়া মুজিব হলের বাংলা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একদল বন্ধুর সাথে আমরা নিয়মিত বসতে শুরু করি। আমাদের সাথে সূর্যসেন হল ও জিয়া হলের আরো কিছু গণরুমের বন্ধুরা এসে যোগ দেয়। ঘটনার বিরূপ অভিজ্ঞতা ছাড়াও ক্লাসে ক্লাসে শিক্ষকদের কথাবার্তা শুনে এরা সবাই বন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য বিবেকের তাড়নায় দংশিত হচ্ছিল। আমরা প্রায় ২৫ জন ছাত্র প্রতিদিন মুজিব হলের নিচতলার একটা কক্ষে মিলিত হতাম। একসাথে রেডিও শুনতাম এছাড়া নানা উৎসে পাওয়া ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতাম। সবাই একসাথে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির ব্যাপারে কী করা যায় এই চিন্তায় বিভোর হতাম। এর মাঝে বিভিন্ন সংবাদকর্মীদের সাথে দেখা করে আমাদের দাবি জানাতাম। নভেম্বরের শুরুতে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবিতে আমরা মানববন্ধন করার সিদ্ধান্ত নিই এবং ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মানববন্ধন করি। সেদিনের মানববন্ধনে বিবেকের তাড়নায় সহপাঠী বন্ধু ও শিক্ষকদের জন্য উদ্বেগী প্রায় দেড়শো ছাত্র অংশ নিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর ওটাই ছিল ক্যাম্পাসে কোনো প্রথম প্রকাশ্য কর্মসূচি। আমার পরিচিত সব বামপন্থী নেতাকর্মীরা উৎসুক, ভীতি আর সন্দেহ নিয়ে দূরে থেকে মানববন্ধন নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছিল। এরপর আমরা ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবিতে সংগঠিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন হলের গেস্টরুম, গণরুম, চায়ের দোকান ও আড্ডাস্থলগুলোতে নিয়মিত প্রচারণা চালাচ্ছিলাম। এর মাঝে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলোর প্ল্যাটফর্ম নির্যাতনবিরোধী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ লিফলেট প্রকাশ করে ও ক্যাম্পাসে নিয়মিত প্রচার কাজ চালাচ্ছিল। নভেম্বরের শেষের দিকে আইইআর ও জহুরুল হক হলের একদল ছাত্রলীগ কর্মী ‘ছাত্রবন্ধু ব্যানারে’ ক্যাম্পাসে সরব মিছিল করা শুরু করে। হিজবুত তাহরীও এ সময় তাদের ছাত্রসংগঠন ‘ছাত্রমুক্তি’র ব্যানারে পোস্টার ও লিফলেট প্রকাশ করে। চারুকলা ইন্সটিটিউট থেকে বের করা হয় প্রতিবাদী শব মিছিল।

প্রথম মানববন্ধনের পর হতেই আমরা মধুতে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলন করতে থাকি। মানববন্ধনের সফলতা আমাদের জন্য বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। তখন অনেক সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এসে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছিল। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমরা যখন দ্বিতীয় মানববন্ধনটাও সফলতার সাথে করে ফেললাম তখন থেকেই একদল ভুয়া বামপন্থী আমাদের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগতভাবে আমার বিরুদ্ধে হিযবুত তাহরির সাথে সম্পৃক্ততার গুজব ছড়াতে শুরু করে। অথচ ওই সংগঠনের সাথে কখনোই আমার কোনো ধরনের যোগাযোগ ছিল না। এই উদ্দেশ্যম লক প্রচারণার নেতৃত্বে ছিল ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতাকর্মীরা। বিশেষ করে বিপ্লব মন্ডলসহ ফ্রন্টের ছেলেরা যাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী হাতে পাওয়া মাত্র পার্টি নেতৃত্বের সাথে পার্টির নারীকর্মীদের যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে দল ছেড়ে এখন চাকরি-বাকরি নিয়ে সুখে-শান্তিতে আছে। এর একটা কারণ ছিল চিন্তা পাঠচক্রের সাথে আমাদের যোগাযোগ। বিশেষ করে সেই সময় ঢাকা শহরের বামপন্থী মহল ওই পাঠচক্রকে চরমপন্থী ইসলামি রাজনীতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তাদের সমুদয় শক্তি নিয়ে ব্যাপৃত ছিল। এটা তাদের বুঝতে না পারার ভুল নাকি সেক্যুলার চিন্তার বাইরে যেতে না পারার অক্ষমতা তা বোঝা দুষ্কর।

জানুয়ারির শুরুতে ‘রাষ্ট্রবিচার সংঘ’ ব্যানারে জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে পরিস্থিতি নিয়ে

দৈনিক পত্রিকায় লিখিত ফরহাদ মযহারের নিবন্ধসমূহের সংকলন ‘ক্ষমতার বিকার ও গণশক্তির উদ্বোধন’-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান আয়োজন করি আমরা। ওই অনুষ্ঠানে ফখরুদ্দিন আমলের বিরাজনীতিকরণ ও সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়বৃত্তির সমালোচক হিসেবে ওই সময় যেসব লেখক, বুদ্ধিজীবী সক্রিয় ছিল তাদেরকে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাই আমার দেশের বর্তমান চেয়ারম্যান কলামিস্ট মাহমুদুর রহমানকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। যা ক্যাম্পাসের প্রগতিশীল ছাত্র-শিক্ষক মহলে বাজে প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। কেননা তিনি বিএনপি আমলে জ্বালানি উপদেষ্টা থাকাকালে ফুলবাড়ি কয়লা খনি শ্রমিকদের উপর গুলি চালানোর ঘটনার জন্য বামপন্থী মহলে তাকে দায়ী করা হতো। এ ঘটনার পর ক্যাম্পাসে আমাদের প্রচণ্ড তোপের মুখে থাকতে হচ্ছিল। অনুষ্ঠানের ৩ দিনের মাথায় ছাত্র ফেডারেশন ও লেখক সংঘের একদল কর্মী পাঠরত অবস্থায় লাইব্রেরিতে ঢুকে আমার উপর আক্রমণ করে। এত প্রতিকূল পরিবেশের ভেতরে থেকেও ক্রমেই আমরা গুছিয়ে নিচ্ছি দেখে দুজন সুবিধাবাদী উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি এসে জুটল আমাদের সাথে। একজন খোমেনী অপরজন তৈয়ব হাবিলদার। নৈশকোর্স বিরোধী আন্দোলন, ইউনূস ঠেকাও আন্দোলন এবং ২২ তারিখের গণরায় প্রকাশ ও আন্দোলনে আহত হওয়ায় খোমেনীকে আমরা প্রথমে ইতিবাচকভাবে নিয়েছিলাম। কিন্তু তৈয়ব হাবিলদারের সাথে বরাবরই দূরত্ব রেখে চলছিলাম। বামপন্থী সংগঠনগুলোর অহিংস ব্রতচারী মনোভাব ও ফখরুদ্দিন সরকারের প্রতি নীরব সমর্থন আমাদেরকে আন্দোলনে পৃথক অবস্থান বজায় রাখার তাগিদ দিচ্ছিল।

আমরা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলাম যেখানে ছাত্র-শিক্ষক মুক্তির দাবিতে মতাদর্শিক বিভাজন ভুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্র-শিক্ষকরা একত্রিত হতে পারে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক নির্যাতনের বিরোধিতা নয় একই সাথে প্রতিরোধ করাও ছিল আমাদের লক্ষ্য। আন্দোলনে ছাত্রলীগ সমর্থিত ব্যানার ছিল ‘ছাত্রবন্ধু’, ট্র্যাডিশনাল বামপন্থীদের সমর্থিত ব্যানার ছিল ‘নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ’। কিছু দলচ্যুত বাম ও রাজনীতি সচেতন সাধারণ ছাত্রছাত্রী যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যোগ দিচ্ছিল তাদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল আমাদের ব্যানার। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রদল সমর্থিত কোনো ব্যানার না থাকায় শুরু থেকে ছাত্রদলের একটা বড় আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। এর মাঝে নির্যাতন প্রতিরোধ এই আন্দোলনের অপ্রতিরোধ্য নেতৃত্ব হয়ে উঠতে দেখে ক্যাম্পাসে আমার ব্যক্তিগত চরিত্র ও জঙ্গি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততার গুজব ছড়ানোর কৌশল নেয় বামপন্থী সংগঠনগুলো। সময়টা ছিল আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ভয়াবহ সংকটের কাল। আমার ক্যান্সার আক্রান্ত মায়ের পাশে থাকতে প্রতি সপ্তাহেই একদিনের জন্য হলেও আমাকে কখনো চট্টগ্রাম, কখনো নেত্রকোণা, কখনো ময়মনসিংহ, কখনো খাগড়াছড়ি যেতে হচ্ছিল। এ সময় আমার মায়ের অপারেশনের সময় ময়মনসিংহ যাওয়ার তিন দিনের মাথায় প্রথম আলোতে তিন কলামের এক ঢাউস নিউজ ছাপা হয়। নির্যাতন প্রতিরোধ ছাত্র আন্দোলনের নামে ঢাবি ক্যাম্পাসে শতাধিক শিবির কর্মীর মিছিল। মিছিল থেকে নারায়ে তাকবির, আল্লাহুআকবার শ্লোগান দেয়া হয়েছিল। আমি তৎক্ষণাৎ ঢাকায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। ক্যাম্পাসে ঢোকা মাত্র আমার কাছে একটা ফোন কল আসে। আমাকে ক্যাম্পাস ছেড়ে যেতে বলা হয় অন্যথায় জঙ্গি মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। পরের ৩ দিনেও এ ধরনের হুমকিসহ অনেক ফোন আসে আমার কাছে। এসব হুমকি কানে না-তোলার ফল পরবর্তীতে আমার জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়ে

এসেছিল।

ঢাকায় এসে খোমেনীর সাথে আলাপ করলাম। আর নানা সোর্স থেকে খবর সংগ্রহ করলাম। বুঝতে পারলাম খোমেনী আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে খোমেনী প্রো. শিবির-ছাত্রদল একটা জায়গা থেকে আমাদের ফোর্সটাকে ক্যাপিটালাইজ করার চেষ্টায় নামে। পরবর্তীকালে ছাত্রদলের সাথে তার সখ্যতাকে কাজে লাগিয়ে সে এটা করতেও সক্ষম হয়। তার কাছে আন্দোলনটা ছিল ক্যাম্পাসে একটা ক্ষমতাবলয় তৈরি করে বৈধ-অবৈধ সুবিধা আদায় ও কর্তৃত্ব করার সুযোগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নন সেক্যুলার ধর্মাশ্রিত রাজনীতি নিয়ে কিংবা জেএমবি উত্তর বাংলাদেশে চরমপন্থী ইসলামি সংগঠন সম্পৃক্ততার অভিযোগ থাকলে রাজনীতি তো দূরের কথা, চায়ের দোকানে বসে এককাপ চা খাওয়াও অসম্ভব। আমরা বুঝতে পারছিলাম ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। এসব কাপুরুষ ষড়যন্ত্র তত্ত্বখোর হিপোক্রেট বামপন্থীদের প্রোপাগান্ডা বেশ কাজে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে ছাত্র সংগঠনতো দূরের কথা কোনো আন্দোলন গড়ে তোলাও অসম্ভব। তার উপর চিন্তা পাঠচক্রের বন্ধুদের মাঠবিমুখতা তথা কাকের বাসায় কোকিলের ডিম পাড়ার প্রবণতা আমাকে দিন দিন হতাশ করে তুলছিল। সাথের ছেলেদের দায়বদ্ধতার কথা ভেবে আন্দোলন ছেড়ে আসাও আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। আমি এবারের মতো মনে মনে ক্ষান্ত দিলাম। যারা আমাদের সাথে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন কর্মসূচিতে আত্মনিবেদন করেছিল, তাদের সাথে আলোচনা করে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবিতে আমরা চরম কর্মসূচি হিসেবে আমরণ অনশন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। দুদিন পর শিক্ষা উপদেষ্টা ছাত্র-শিক্ষক মুক্তির বিষয়টি নিয়ে সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের কথা জানান ও আইনী প্রক্রিয়ায় সময় ক্ষেপন হচ্ছে বলে ভরসা দিলে আমরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে তড়িঘড়ি একটা সংবাদ সম্মেলন করে আমাদের অবস্থান তুলে ধরলাম এবং ব্যক্তিগত আক্রোশ জলাঞ্জলি দিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তিকে তরান্বিত করার জন্য আন্দোলনকে একটা প্ল্যাটফর্মে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানালাম এবং নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে সংবাদ সম্মেলন শেষ করলাম। এরপরও আমরা আন্দোলনের মাঠ থেকে উঠে আসি। ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির আগ পর্যন্ত আমি বরাবরই ছাত্র নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দের সমস্ত কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে ছিলাম।

মামলার অগ্রগতি ও আন্দোলনের পরিণতি

জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে ক্যাম্পাস মিছিলে মিছিলে মুখরিত হয়ে ওঠে। একদিকে খোমেনী-তৈয়ব হাবিলদারের নেতৃত্বে ছাত্রদল-শিবিরকর্মীদের দীর্ঘ মিছিল অন্যদিকে বামপন্থী নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দের ধারাবাহিক প্রচারণা।

১১ই জানুয়ারি নির্যাতন প্রতিরোধ ছাত্রছাত্রীবৃন্দের ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত ক্লাস বর্জন ও কালো ব্যাজ ধারণ করে অপরাজেয় বাংলা থেকে কার্জন হল পর্যন্ত বিশাল মানববন্ধন আয়োজন করে। এতে প্রায় ২০০০ হাজার শিক্ষার্থী যোগ দেয়। আমরাও এই কর্মসূচিকে সফল করতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছিলাম। ২১ তারিখ ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ সম্মেলন থেকে নির্যাতন প্রতিরোধ ছাত্র আন্দোলন ও নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ছাত্র-শিক্ষক মুক্তির জন্য ২৩ তারিখ পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। ততদিনে সরকার ৪টি মামলা ছাড়া বাকি মামলাগুলো প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। ২১ জানুয়ারি শুনানিতে ১টি মামলা

থেকে শিক্ষকদের অব্যাহতি দেয়া হয়। অপর মামলায় জরুরি অবস্থা ভঙ্গ, নৈরাজ্য তৈরি ও ছাত্রদের উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত ছাত্র-শিক্ষকদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও জরিমানা করা হয়। বাকি মামলাগুলোতেও একই ধরনের রায় হয়। শেষাবধি রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেয়া হয়।

শামসুদ্দোজা সাজেনের সাক্ষাৎকার

[সেনা সদস্যের গাড়ি পোড়ানো ৫৮ নং মামলার অন্যতম আসামী ও তৎকালীন ঢাবি ছাত্র ফেডারেশনের প্রচার সম্পাদক]

মাহমুদ হাছান : আগস্ট মাসের অভ্যুত্থানের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন ও ছাত্রকর্মীদের প্রতি কেন্দ্রীয় ছাত্র ফেডারেশন বা গণসংহতি ম্যাসেজটি কী ছিল?

সাজেন : শুরুর দিকে মরহুম আরিফ ভাই, সাকি ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলেন, আমরা তার কাছ থেকে সব শুনে নিতাম।

মা.হা : আপনাদের উপর কী ধরনের নির্দেশনা ছিল?

সাজেন : আমাদের উপর নির্দেশনা ছিল ঘটনায় যাও, অবজার্ভ কর।

মা.হা : অর্থাৎ ঘটনাস্থলে যাও, বিক্ষোভে অংশ নাও...

সাজেন : ঠিক অংশগ্রহণ না, সকাল থেকে মিছিল হবে। মিছিলের পর মিছিল করে ব্যানারটাকে দাঁড় করাতে হবে। সেই সাথে সচেতনভাবে লক্ষ রাখা, কারা বিক্ষোভে কী ভূমিকা রাখছে, ঘটনা কোনদিকে যাচ্ছে...

মা.হা : কোন্ ব্যানার?

সাজেন : নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

মা.হা : ২১ তারিখ দিনটা কীভাবে কেটেছিল?

সাজেন : সকালে আমি হল থেকে বের হবার পর দেখি তোমরা সূর্যসেন হলের মোড় থেকে মিছিল নিয়ে এগুচ্ছো। আমি তোমাদের মিছিলের পিছু পিছু ডাকসুর সামনে আসি। ওখানে ছাত্র ফেডারেশন ছাড়াও আরও বামপন্থী সংগঠনের কর্মীরা তখন জড়ো হচ্ছিল। ওখানে গিয়ে জানতে পারি পাবলিক লাইব্রেরির সামনে থেকে মিছিল হবে। আমরা পাবলিক লাইব্রেরির সামনে গিয়ে আরো লোকজন জড়ো করে মিছিল করে অপরাজেয় বাংলায় আসি।

মা.হা : মিছিলে কারা ছিল?

সাজেন : মিছিলে মূলত ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরাই বেশি ছিল। এছাড়া বেশকিছু সাধারণ ছাত্রছাত্রীও ছিল। অপরাজেয় বাংলার সামনে লুবনা আপা যখন বক্তৃতা করছিলেন, শামসুন্নাহার হল আর রোকেয়া হল থেকে আরো দুটি মিছিল সেখানে এসে ভিড়েছিল।

মা.হা : ওই মিছিলগুলো কাদের ছিল?

সাজেন : শামসুন্নাহার হলের মিছিলে ছাত্র ফেডারেশনের শর্মিলা, প্রপদের শুভ্রা দি, নূরী আপা, আই.আর-এর শিমু, উনারা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। রোকেয়া হল থেকে আসা মিছিলটায় ফ্রন্টের তন্বী নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ওরা যখন আসে তখন লুবনা আপার বক্তৃতা চলছিল। ওখান থেকে একটা মিছিল বিজনেস ফ্যাকাল্টির দিকে রওনা হয়। আর একটা মিছিল নিয়ে আমরা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করেড়অপরাজেয় বাংলায় ফিরে এসে শুনলাম শাহবাগে মারামারি চলছে। ওখানে যাওয়ার পথে দেখি একদিকে মসজিদের সামনে ছাত্ররা আর অন্যদিকে চারুকলার সামনে পুলিশ অবস্থান নিয়েছে। ওখান থেকেই ঢিল পাল্টা ঢিল চলছিল। আমার এক বন্ধু জাহিদ পুলিশকে মারবে বলে পুলিশকে লক্ষ করে দৌড় দিল। পুলিশের ছোড়া একটা ইট এসে ওর মাথায় লাগে আর

ও মাটিতে পড়ে যায়। ওর মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরুি ছল। আমি আর মিথুন ভাই ওকে তুলে নিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হই। ততক্ষণে মুহুর্মুহু ইটপাটকেলের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। পুলিশও বেশুমারে টিয়ার শেল নিক্ষেপ করছে। মেডিকেল যাওয়ার পথে টিএসসিতে দেখি পুলিশ সোহরাওয়ার্দীর গেট থেকে এগিয়ে এসে রাজু ভাস্কর্যের সামনে থেকে রোকেয়া হল ও লাইব্রেরির দিকে টিয়ার শেল ছুড়ছে। রোকেয়া হলের সামনে অবস্থান নেয়া ছাত্রীরাও পাল্টা ঢিল ছুড়ছিল।

মা.হা : ওখান থেকে কোথায় আসলেন?

সাজেন : হাসপাতালে ২ ঘণ্টা কাটিয়ে আমি ক্যাম্ াসে ফিরে আসি। সিড়র উত্তর পরিস্থিতিতে ত্রাণ কাজ চালানোর জন্য তখন ডাকসুতে ছাত্র ফেডারেশনের স্যালাইন কার্যক্রম চলছিল। তারপর দিনভর বিভিন্ন সংঘাত স্থলে ঘুরেফিরে অবজার্ভ করে দিন কাটাই।

মা.হা : সেদিন কোনো প্রচারপত্র বা বিশেষ পরিস্থিতি চোখে পড়েছিল।

সাজেন : হ্যাঁ, একটা লিফলেট 'উপদেষ্টাগিরি উড়িয়ে দাও, ভাড়াটেগিরি খামোশ করো' সম্ভবত তোমরা বের করেছিলে। মুজিব ওটা আমাকে দিয়েছিল।

মা.হা : সেদিন ছাত্র ফেডারেশন বা প্রগতিশীল জোটের কোনো সাংগঠনিক বৈঠক হয়েছিল?

সাজেন : সন্ধ্যার পর আমরা টিএসসিতে খেলার রুমে মিটিংয়ে বসেছিলাম।

মা.হা : মিটিংয়ে কারা ছিল?

সাজেন : আরিফ ভাই, নান্টুদা, মলয় দা, বিপ-ব মণ্ডল, মানবদা, হোসেন ভাই, প্রপদের শুভ্রাদিসহ প্রগতিশীল নেতারা ছিল।

মা.হা. : মিটিংয়ে কী নিয়ে আলোচনা হয়?

সাজেন : মিটিংয়ে সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য ও দাবিদাওয়া নির্ধারণ নিয়েই তর্ক চলছিল। আমরা সেখানে সিদ্ধান্ নিই আগামী কালের জন্য একটা লিফলেট ছাপাবো। সেনা ক্যাম্ তুলে নিতে হবে, ছাত্রদের উপর সেনা-পুলিশ হামলার বিচার এসব বিষয়ে সবাই একমত হি ছল। কিন্তু জরুরি অবস্থা এখনই তুলে নেয়ার দাবি জানানো হবে কিনা এটা নিয়ে বেশ কথা কাটাকাটি হি ছল। একদল বলছিল আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কেননা আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ছড়িয়ে পড়লে তার পরিণতি ও নেতৃত্ব আমাদের আওতার বাইরে চলে যেতে পারে, আন্দোলনের ভিতর প্রবেশ করে কোনো স্বার্থন্বেষী মহল একে ভুল পথে ধাবিত করতে পারে। তখন আর আন্দোলন আমরা ধারণ করতে পারবো না। এইসব আশঙ্কা থেকে আমরা কিছুটা কনফিউজড হয়ে পড়েছিলাম। শেষ পর্যন্ সেনা ক্যাম্ প্রত্যাহার, আর্মি চীফের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া, দোষী আর্মি-পুলিশদের বিচারের দাবি সম্বলিত লিফলেটের খসড়া প্রস্তুত করা হয়। মানবদা এর সাথে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার ও শেখ হাসিনার মুক্তির দাবি জুড়ে দেওয়ার জন্য খুব জোরাজুরি করছিল। লিফলেট ছাপানোর দায়িত্ব নেয় ছাত্রফ্রন্ট। সিদ্ধান্ হয় পরের দিন সকালে আমরা ওই লিফলেট নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। অথচ পরের দিন সকালে এসে জানতে পারি তারা লিফলেট ছাপেননি। কেন ছাপেননি এই উত্তর

এখনও আমার কাছে অজানা। সকালে ছাত্রলীগের একটা গ্রুপ নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দের নেতাদের সাথে আলোচনা করতে এসেছে। কিছুক্ষণ পর তারা সংবাদ সম্মেলনের দাবিনামায় শেখ হাসিনার মুক্তির বিষয়টা অন্ভুর্ক্ত করতে বললে নেতারা যথারীতি তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। লিফলেট না পেয়ে হতাশ হয়ে শাহবাগ যাই ঘটনার অগ্রগতি অবজার্ভ করতে। কিছুক্ষণ পর মধুতে ফিরে এসে দেখি সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছে। বাইরে এককোণে দাঁড়িয়ে মানবদা, নান্টুদা, আরিফ ভাই শলাপরামর্শ করছে। আমাকে আবার শাহবাগে পাঠানো হয়। ঘণ্টাখানেক পর শাহবাগ থেকে ফিরে এসে শুনি সংবাদ সম্মেলনে শুরু হলে ছাত্রলীগের লোকজন এসে সংবাদ সম্মেলন প- করে দেয়। ওরা যখন সংবাদ সম্মেলন প- করছিল মানবদা তখন বাইরে দাঁড়িয়েছিল। সবাই হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে এসে বাইরেই সংবাদ সম্মেলন করার চেষ্টা করে। কিন্তু উপস্থিত সাংবাদিকরা ছাত্র ইউনিয়ন ও মানবদার ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তারা সুযোগ নেয় এবং একাই সংবাদ সম্মেলন করে।

মা.হা : আমিও তখন মধুতে ছিলাম। আ ছা তারপরের ঘটনাক্রম বলেন?

সাজেন : ওই দিন সারাদিন ঘুরেফিরে পরিস্থিতি দেখছিলাম। আমাদের কাজ আলাদা করে ভাগ করা ছিল। আরিফ ভাই আর মলি-ক ভাইয়ের কাজ ছিল শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রাখা। আমাদের কাজ ছিল সেন্ট্রাল লাইব্রেরি থেকে শাহবাগ পর্যন্ নজরদারি করা।

মা.হা : কেন? আপনার সাথে তো আমার মহসিন হলের মাঠেও দেখা হয়েছিল...

সাজেন : হ্যাঁ, এফ রহমান হলের সামনের সংঘাত দেখতে আমি তখন ওদিকে যাি ছলাম।

মা.হা : আ ছা এরপর বলেন...

সাজেন : সন্ধ্যা পর্যন্ ক্যাম্ াসেই ছিলাম, কারফিউর খবর পাওয়ার পর হলের দিকে যাওয়ার পথে দেখলাম তোমরা মিছিল করছ 'আমাদের ক্যাম্ াস আমরাই থাকব'। হলে গিয়ে দেখি ছাত্রদলের ছেলেরা ছাত্রদের হল না ছাড়ার আহ্বান জানাে ছ। আমি সন্ধ্যার পর ক্যাম্ াস ছাড়ি।

মা.হা : ক্যাম্ াস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আপনার কাছে কোনো ফোন এসেছিল, কিংবা পুলিশ বা অন্য কোনো সরকারি সন্ াসী আপনার পিছু নিয়েছিল?

সাজেন : হ্যাঁ, আমার বাড়িতে পুলিশ গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাথিতে আমার স্থায়ী ঠিকানা রাজবাড়ী। কিন্তু আমার পরিবার তখন যশোর থাকতো। রাজবাড়ীতে পুলিশ বেশ কয়েকবার হানা দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে কেউ না থাকায় বোধহয় আমি গ্রেফতার এড়াতে পেরেছিলাম।

মা.হা : এবার আসা যাক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে...

সাজেন : ক্যাম্ াস খোলার আগেই আমরা নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ব্যানারটাকে দাঁড় করানোর প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম। পোস্টার ও ব্যানার তৈরি করা ছিল। ক্যাম্ াস খোলার পরদিন আমরা কলা ভবনের বারান্দায় প্রথম মিছিলটা করি। সেখানে তুমিও ছিলে। আমরা পরিস্থিতির বিশে-ষণ ও ছাত্র-শিক্ষক মুক্তির দাবি সম্বলিত একটা লিফলেট বের করি এবং সেটা ক্লাসে ক্লাসে, হলে হলে

ছড়া ি ছলাম।

মা.হা : বিক্ষিপ্তভাবে চলতে থাকা আন্দোলনের প্রবণতাগুলো আপনার সংগঠন কীভাবে দেখছিল?

সাজেন : প্রথম কথা হলো সংগঠনে আমরা তখন যে লেভেলের কর্মী আমাদেরকে সবসময়ই একটা অস ষ্টতার ভেতর রাখা হতো। একদিকে তখন পর্যন ব্যক্তিগতভাবে আমার এ ধরনের বড় আন্দোলনের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না কিন্তু সংগঠনের ছিল। অন্যদিকে সাধারণ ছেলেরা এই ইস্যুতে আন্দোলন করাটা খুব পজিটিভলি নি ছল। আসলে আন্দোলনের দাবি নিয়ে বিশেষ চিন ায় কিছু ছিল না, সর্বজনীন দাবি ছিল ছাত্র-শিক্ষক মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার। কিন্তু আমি ভাবছিলাম এই যে বিশাল স্টুডেন্ট ফোর্সটা, পরিস্থিতি যাদের ভিতর আন্দোলনের উৎসাহ ও ইতিবাচকতা এনে দিয়েছে তাদেরকে সংগঠিত করে সুদ রপ্রসারী প্রকল্পের ভিতর কি করে আনা যায়। পরিস্থিতি ছাত্রলীগ ছাত্রদলের বাইরে বামপন্থী সংগঠনগুলোর জন্য একটা স্ েস তৈরি করেছিল। আন্দোলনের প্রয়োজনে তথা গ্রেফতারকৃত ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, সমবেদনা ও দায়িত্ববোধ থেকে বামপন্থী সংগঠনগুলোর উপর একধরনের নির্ভরশীলতা তৈরি হয়েছিল। আমরা এই আন্দোলনটাকে আমাদের ছাত্র রাজনীতিতে সত্যিকারের পরিবর্তন আনার কাজে ব্যবহার করতে চা ছলাম। তো আমাদের পরিকল্পনা ছিল এই আন্দোলন থেকে কিভাবে নতুন কর্মী বের করে আনা ও সংগঠনকে আরো বিস ৃত ও জনপ্রিয় করে তোলা। ছাত্র-শিক্ষক মুক্তির দাবিতে আন্দোলনে যোগ দেয় সাধারণ ছাত্রদের যে সেন্টিমেন্ট তা থেকে বামপন্থী সংগঠনগুলোর সেন্টিমেন্ট একেবারেই আলাদা। এ ধরনের আন্দোলনকে ক্যাপচার করা তথা ছাত্রদের উপর নেতৃত্ব কায়েম করাই তাদের ম ল প্রবণতা। তাই তখন মনে হ ি ছল এটা যতটা না ছাত্রদের ইস্যু তারও অধিক তাদের সাংগঠনিক ইস্যু। এটা স ষ্ট নয় এ ধরনের আন্দোলন থেকে তারা আসলে কী চায়? কেননা, এটা তাদের কাছে একই সাথে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্ন হয়ে আসে। অর্থাৎ জাতীয় পর্যায়ে তাদের ম ল দল যে রাজনীতিটা করে সেই রাজনীতিরও প্রশ্ন।

মা.হা : এই আন্দোলনে যোগ দেয়া নন-সেক্যুলার ফোর্সগুলো আপনারা কিভাবে দেখছিলেন?

সাজেন : প্রথম প্রথম আমরা এটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাইনি। কিন্তু পরে যখন দেখলাম হিজবুত তাহরির লোকজন বাড়ছে। পোস্টারে পুরো ক্যাম াস ছেয়ে যা ে ছ, তখন সিদ্ধান নিই এদের ঠেকাতে হবে।

মা.হা : অর্থাৎ আন্দোলনটা শুধুমাত্র ছাত্র-শিক্ষক মুক্তির প্রশ্নে নয়, একইসাথে এই আন্দোলনের সুযোগে কোনো নন-সেক্যুলার ফোর্স যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কাজের ক্ষেত্র তৈরি করতে না পারে তার একটা সচেতন প্রয়াসও ছিল?

সাজেন : আসলে হিযবুহ তাহরি নিয়ে আমরা এক ধরনের অস ষ্টতায় ছিলাম। তেমন কিছু আসলে জানতামই না। তাদের প্রচাতি লিফলেটে সেনাবাহিনীকে বাঁচিয়ে ঘটনার জন্য কেবলমাত্র ফখর৬দ্দিনের সরকারকে দায়ী করা হয়েছিল। ঐ লিফলেটে জর৬রি অবস্থার সময় ও বিদেশে সেনাবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল

ভূমিকার কথা যতটা ছিল, ছাত্র-শিক্ষকদের উপর নির্যাতন ও হয়রানির কথা তার কিয়দংশ ছিল না। তাই তাদের সাথে ডি.জি.এফ.আই.-এর যোগাযোগের যে গুজব বাজারে চালু ছিল তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ছিল। লক্ষ করছিলাম হিযবুত তাহরি ধীরে ধীরে শিবিরের বাইরে একটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ইসলামি ফোর্স হিসেবে একটা জায়গা তৈরির চেষ্টা করছে। তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পোস্টার ও পোগান দিয়ে একটা গ্রাউন্ড তৈরি করে আমাদের রাজনীতির লিগ্যাসি নষ্ট করার চেষ্টা করছিল। তখন কমার্স ফ্যাকাল্টি থেকে ৪০-৫০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়মিত তাদের সাথে মিটিং-মিছিল করছিল। একদিন ওরা মধুতে এসে বসে। আমরা তখন ওখানে ছিলাম। বিপ-ব ম ল ও মলি-ক ভাই উঠে গিয়ে তাদেরকে মধু থেকে বের হয়ে যেতে বলে। তারা দাবি করে তারা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করছে, মধুতে বসাটা তাদের অধিকার। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে মলি-ক ভাই তাদের একজনকে জোরে ধাক্কা মারে। তারা মধু থেকে বেরিয়ে আই.বি.এর গেটে অবস্থান নেয়। তারা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল বলে বামপন্থী সংগঠনের কর্মীরা ভয় পেয়ে মধুর সামনে দরজা আটকে মধুর ভিতর থেকেই 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' বলে পোগান দি ছল। আমি আর নিয়াজের ভাগ্নে রাইহান ভেতর থেকে চেয়ার নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে তাদের দিকে তেড়ে গেলে আমাদের পিছু পিছু আরো কিছু ছেলে বেরিয়ে আসে ও মারামারি বাঁধে। ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা ছাত্রলীগকে ফোন করলে ছাত্রলীগের ছেলেরা লাইব্রেরির সামনে থেকে দৌড়ে আসে এবং হিযবুত তাহরির ছেলেদের ধাওয়া করে কমার্স ফ্যাকাল্টিতে তুলে দিয়ে আসে। একজন ধরা পড়লে তাকে বেধড়ক মার দেয়া হয়েছিল। তখন থেকেই ছাত্রলীগ যেখানেই হিযবুত তাহরিরকে পা ি ছল আক্রমণ করছিল। হিযবুত তাহরিকে এই ঘটনার পর ক্যাম াসে খুব একটা দেখা যা ি ছল না।

মা.হা : আ ছা আপনাদের সাথে তো প্রায় প্রতি রাতেই মুজিব হলে আমাদের দেখা হতো। আমরা তখন মুজিব হলের নিচতলার একটা র৬মে নিয়মিত বৈঠক করতাম। এটা আপনাদের সংগঠন কিভাবে দেখছিলো?

সাজেন : আসলে সংগঠন থেকে আমাদের বলা হ ি ছল, ওরা যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ ছাত্রদের সংগঠিত করছে তোমরা পারছ না কেন? কিন্তু পরে খোমেনী এসে যখন তোমাদের সাথে যোগ দিল তখন পরিস্থিতি বদলে গেল। শুর৬ থেকেই আমরা আশঙ্কায় ছিলাম আন্দোলনের ভিতরে থেকে ছাত্রদল-শিবির উস্কানি দিয়ে আবার নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছে। অনেকটা পিছন থেকে ছুরি মারার মতো। আমরা যখন হলে হলে ক্যাম্পেইন চালাতাম তখন তোমাদের কর্মস চিতে যোগ না দেয়ার জন্য ছাত্রদের প্ররোচিত করতাম।

মা.হা : কোনো বিশেষ তাৎপর্যপ র্ণ ঘটনা মনে আছে?

সাজেন : হ্যাঁ, যখন ছাত্র-শিক্ষকরা মুক্তি পেল, তখন তাদেরকে বরণ করে নেয়ার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করছিলাম। কেননা তাদেরকে নিয়ে একটা শোডাউনের ব্যাপার ছিল। অথচ তারা ফিরে আসার পর ছাত্রইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ গোটা

আন্দোলনের কৃতিত্ব নেয়া তথা ফসল চুরির কাজে নেমে পড়ল। তাহলে আমরা কী করলাম? এটা নিয়ে পার্টির ভিতর কথা হি ছল। আমরা ভেবেছিলাম মানবদা ই ছা করে ধরা দিয়েছে। কেননা ওই সময় জেলে যাওয়াও ছিল রাজনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া। আশপাশে কিছু উদ্ভট ঘটনা ঘটছিল। ভাবছিলাম যেভাবে এঞ্জেল বা দীন ইসলামকে ধরেছে আমাকে ধরছে না কেন? ব্যক্তিগতভাবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সেনাবাহিনীর গাড়ি পোড়ানোর মামলায় আমাকে আসামীও করা হয়েছিল অথচ আমাকে ধরছে না। তোমাদের কাউকেই তো ধরল না। উল্টো ছাত্রদল ছাত্রলীগের নেতাদের ধরা হে ছ। এগুলো কি অদ্ভুত ঘটনা না? আমি তো আন্দোলনেই ছিলাম, বরাবরই ক্যা াসে ছিলাম। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, সরকার বা সেনাবাহিনী কী নীতি হাতে নিয়েছে। তবে এতটুকু বুঝতে পারছিলাম, দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনকে সরকার হুমকি হিসেবে নি ছে না। রাষ্ট্র আগস্ট মাসে যে ক্রাইসিসে পড়েছিল তা থেকে তারা উঠে আসতে পেরেছে। আপাতত হলেও ঘটনা একটা সমাধান তারা খুঁজে পেয়েছে। গ্রেফতারকৃত ছাত্র-শিক্ষকদের কিভাবে ছাড়া হবে এ ব্যাপারে সিদ্ধা হয়ে গেছে। তাই মুভমেন্টে কোনো বাধা দি ছ না। ছাত্র-শিক্ষকরা মুক্তি পেলেই ইস্যুটা হারিয়ে যাবে। আক্ষরিকভাবে হয়েছেও তাই। আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়ত্বশাসন ও পুলিশী সেনা স াসের ধরন নিয়ে যে সিরিয়াস প্রশ্নগুলো উঠতে পারতো তাকে এড়িয়ে সরকার ও সেনাবাহিনী পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মা.হা : শেষমেশে আগস্ট অভ্যুত্থান নিয়ে আপনার ম ল্যায়ন...

সাজেন : সত্যি কথা কী, আন্দোলনের পর আমার ভেতর এক ধরনের হতাশা জেঁকে বসেছিল। কেননা, যেভাবে ছাত্রদের উপর বর্বর পুলিশী হামলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়ত্বশাসন ল ঘন, ছাত্র-শিক্ষকদের ধরে নিয়ে রিমান্ডে ভয়াবহ নির্যাতন সেনাবাহিনী চালিয়েছে তার কোনো তদ হয়নি। উল্টো বিষয়টাকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। কেননা আদালতের রায়ে ঢাকা-রাজশাহী ছাত্র-শিক্ষকদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও জরিমানা করা হয়েছিল। যদিও রাষ্ট্রপতির ক্ষমায় সবাইকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল তথাপি আমার ধারণা আদালতের রায়ে ছাত্র-শিক্ষকদের নৈতিক পরাজয় ঘটেছে...

ফখরুদ্দিনের ফুঁ : বিক্ষোভের পটভূমি

দেশে তখন জরুরি অবস্থা চলছে। (২০০৭ সালে জানুয়ারি মাস হতেই নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শীর্ষ দুই রাজনৈতিক দলের বিতর্ক ক্রমেই প্রাণঘাতী সংঘাতের দিকে মোড় নি ছিল। এই সুযোগে তৎকালীন সেনাপ্রধান মঈন উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং ফখরুদ্দীন আহমেদকে প্রধান করে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের সমর্থনে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ক্ষমতায় বসানো হয় ও সারাদেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। ওই সরকার ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ াসের বিরুদ্ধে অনন্ যুদ্ধ প্রকল্পের অধীন একটা সরকার। তাই দেখা গেল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান না করে সেনাবাহিনীর সহায়তায় সন্ াসবাদের বিরুদ্ধে অনন্ যুদ্ধের কাঠামো প্রস্তুত করা

ও বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর কাঠামোগত সংস্কার কর্মস চি বা বায়নে ব্য হয়ে ওঠে। একই সময় ড. ইউন সকে কেন্দ্র করে উন্নয়নবাদী সুশীল সমাজ ও সমাজের বিভিন্ন স রের সুযোগ সন্ধানী গণবিরোধী ব্যক্তিরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। মাইনাস টু থিওরির দংশনে শীর্ষ দুই রাজনৈতিক দলে ভাঙ্গন লেগেছিল। রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তায় ভুগছিল। দুর্নীতির দায়ে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ নেতা কারাগারে। সভা-সেমিনারসহ সব ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের শিকার হয়ে শীর্ষ স্থানীয় ব্যবসায়ী, সাবেক সরকারি আমলা, রাজনীতিবিদসহ অনেক সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। সেইসাথে যানজটমুক্ত-পরি ছন্ন-স্বাস্থ্যসম্মত শহরের মিথ ছড়িয়ে সরকার ও যৌথবাহিনী সারা শহরে শুদ্ধি অভিযান চালা ছে। শহরকে যানজট মুক্ত করতে ফুটপাত থেকে বিপুল পরিমাণ হকারকে উ ছেদ করা হয়েছিল। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ মতে রা া থেকে হাজার হাজার রিকশা তুলে দেয়া হে ছ। তার উপর একটার পর একটা রা া ভিআইপি করা হে ছ। সরকারি জায়গা উদ্ধারের নামে, মাদক ব্যবসা ও অপরাধ দমনের অপরাধ দমনের নামে একের পর এক বস্ি ভেঙে দেয়া হি ছল। নদীর পাড়, লেক, বেড়িবাঁধ, রেলওয়ে কলোনিসহ বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ স্থাপনা উ ছেদ করা হি ছল। সরকারের এসব শুদ্ধি অভিযানে শহরের একটা বিশাল অংশের শ্রমজীবী মানুষ জীবিকা ও আবাসন হারিয়ে রীতিমতো পথে নেমে এসেছিল। ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় জোট আমলের গড়ে ওঠা অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ভাংতে না পারার কারণে খাদ্যদ্রব্য, ভোগ্যপণ্য, ঔষধ, ইলেকট্রিক পণ্য, পোশাক ও যোগাযোগ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। এমনকি শহরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভেজাল মালের যে অবৈধ কারবার চলে, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের একটা বিশাল অংশ তার কর্মসংস্থান ও নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনে এসবের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এসব অবৈধ কারবারকে শহরের মানুষ জীবনের প্রয়োজনে বৈধতা দিয়ে আসছে বছরের পর বছর ধরে। যৌথবাহিনীর আচমকা তল-াশি ও দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের ভয়ে বাজারে কালোটাকার প্রবাহে স্থবিরতা তৈরি হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে খাদ্যগুদামসহ অন্যান্য ছোট ও মাঝারি মাপের হাজারের অধিক কলকারখানা-গোডাউন লাইসেন্স, কর ফাঁকি ও হেলথসার্টিফিকেট ইত্যাদি সমস্যার কারণে সিলগালা করে দেয়া হয়েছিল। দ্রব্যম ল্য নিয়ন্ ণের জন্য সরকার কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নি ছিল না। উল্টো সেনা-বিডিআর দিয়ে অপারেশন ডাল-ভাত চালিয়ে লোকজনের চোখে ফাঁকি দেয়ার তালে ছিল। বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহে স্মরণাতীত কালের ভয়াবহ ঘাটতি নেমে এসেছিল। ফখরুদ্দীন এক ফুঁ দিয়ে ৩০ বছরের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোতে জেঁকে বসা অব্যবস্থাপনা সারিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। চোখের সামনে মহা প্রতাপশালী রাজনীতি ও ব্যবসায়ীদের, যাদের দোর্দ ক্ষমতার প্রতাপের সামনে সারাদেশের মানুষ জিম্মি হয়েছিল। তাদের অসহায়ত্ব দেখে সাধারণ মানুষ বেশ মজা পা ছিল। কিন্তু তাদের বা ব সমস্যা সমাধানে সরকার কোনো আশাবাদ জাগাতে বরাবরই ব্যর্থ ছিল। সাধারণ মানুষ সম নাগরিক অধিকার হারিয়ে বুটের ভয়ে অ ি ত্ব সংকোচনে বাধ্য হি ছল। র‍্যাব ও সেনাবাহিনী যেভাবে ব্যাংক, বীমা, মার্কেট, অফিস-আদালত থেকে সাধারণ মানুষের বেডরুম পর্য অবৈধ হ ক্ষেপ চালা ি ছল দালাল গণমাধ্যম তা চেপে গেলেও সাধারণ মানুষের মনে গভীর ক্ষোভ দানা বাঁধে।

সামরিক কনভয়ের হেডলাইটে ত্রস্ত ক্যাম্পাস

জানুয়ারি মাসের জরুরি অবস্থা জারির পরপরই বিশ্বব্যাংকের সুপারিশকৃত ইউজিসির ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র বাস্তবায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে সান্ধ্যকালীন বাণিজ্যিক কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে টানা আন্দোলন ও ধর্মঘটের পর ৩রা ফেব্রুয়ারি অনেকটা আকস্মিকভাবে প্রকাশ্যে মিছিল করে আমরা জরুরি অবস্থা ভঙ্গ করেছিলাম। জরুরি অবস্থার অজুহাতে দালাল গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, সিপিবি ও বাসদের মতো তথাকথিত বামপন্থী প্রগতিশীল দলগুলো নীরবে সরকারও ও যৌথ বাহিনীর অনেক গণবিরোধী কাজ বৈধতা দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবেদনশীল ছাত্ররা তা মেনে নেয়নি। এই ঘটনা যার প্রমাণ। এরপর ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে নোবেল বিজয়ী ড. ইউন সের আগমনকে প্রতিহত করতে ডানপন্থী-বামপন্থী ও সব শিক্ষার্থী সংগঠন একযোগে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে দেবে না বলে ঘোষণা দেয়। ড. ইউন স বিরোধী আন্দোলনের পরপরই হলে হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়ে মোড়ে পুলিশ প্রহরা বসানো হয়। জিমনিসিয়ামে সেনা ক্যাম্প স্থাপন করা হয় এবং রাত ৮টার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনা টহল শুরু হয়। ছাত্রদের উপর নজরদারি করার জন্য মোতায়েন করা হয় বিপুল পরিমাণ গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদারনৈতিক সংস্কৃতির সাথে অপরিচিত-অনভ্যস্ত এসব সেনা ও পুলিশ সদস্যরা মার্চ মাস থেকে রাত ৮টার পর ছাত্রদের স্বাভাবিক চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। এমনকি ছাত্রীদেরকে অশ্লীল কথা বলে উত্যক্ত করাও শুরু করে নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা। মার্চ মাসে নাট্যকলা বিভাগের এক ছাত্রীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে কলাভবনের প্রক্টর অফিস ঘেরাও করে ছাত্ররা। এসব ঘটনার প্রতিকার করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থতা দেখায়। জুলাই মাসে এই পরিস্থিতির এমনই অবনতি ঘটে যে প্রতিদিন কোনো না কোনো ছাত্রের সেনা-পুলিশ দ্বারা মারধর ও তল-াশির কথা শোনা যাি ছল। এই সময় দিনের বেলাতে ক্যাম্পাসে সেনা-র‍্যাবের টহল শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সামরিক কনভয়ের আনাগোনা দেখে অভ্যস্ত নয়। জুলাই মাসে অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রমের নিয়মিত অংশ শরীরচর্চাকে ব্যাহত করে জিমনিসিয়ামে সেনা ছাউনি স্থাপনের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে মতামত জানিয়েছিলেন। তারপরও কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। জনজীবনে ছড়িয়ে পড়া গভীর নৈরাশ্য ও হতাশা এসে ভর করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে।

ছাত্র বিক্ষোভের শ্রেণিগত তাৎপর্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তার গড়ে ওঠার সময় থেকে বাংলাদেশে গ্রামীণ কৃষককে শহুরে মধ্যবিত্তে রূপান্তরের পথে নিয়ে আসছে। এ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। শহর ও গ্রামের মধ্যবিত্ত তার উদ্বৃত্ত আয় সঞ্চয়ের পরিবর্তে এ সন্তানের পেছনে ব্যয় করছে। কখনো হালের জমি বন্ধক রেখে কখনো মহাজনের ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে হলেও শত শত বছরের অভাব অনটন আর অমর্যাদা লাঘবের জন্য তার সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছে। এ সন্তান তার আকাঙ্ক্ষা, এ সন্তান তার ভবিষ্যৎ, এ

সন্তানের বুকের উপর যখন বুটের ঘা লাগে, গুলি ছোড়া হয় তখন চোখের সামনে তার ভবিষ্যতকে গুঁড়িয়ে যেতে দেখে সে নিরুত্তাপ বসে থাকতে পারে না। সেবারও ঘটেছিল তাই। সেইসাথে ফখরুদ্দীন মইন উদ্দীনের শুদ্ধি অভিযানে জীবিকা ও আবাসন হারানো বিশাল অংশের শ্রমজীবী মানুষ এসে যোগ দেয় ছাত্রদের সাথে এবং প্রতিরোধ সহিংস হয়ে উঠে। বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে পাল্টা বল প্রয়োগ শ্রমিক শ্রেণির গুণগত বৈশিষ্ট্য তাই ছাত্রদের সীমিত সহিংসতা তৎকালীন দালাল সরকার ও সেনাবাহিনীকে যতটা ভাবিয়েছিল ছাত্রদের সাথে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের আভাস পেয়ে তারা তারও অধিক ভয় পেয়েছিল। তাই জরুরি অবস্থার বাধন ভেঙে পড়তে দেখে তারা জনগণের আন্দোলন দমনের চরম অস্ত্র কারফিউ জারি করতে বাধ্য হয়।

ছাত্র আন্দোলনের সহিংসতা নিয়ে জনমনে শহুরে মধ্যবিত্ত ও পলিটিক্যাল এলিটদের প্রচারণার প্রভাবের একটি পর্যালোচনা

'জিজেকের মতে ব্যক্তির বলপ্রয়োগ ও সহিংস কর্মকাণ্ডের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে আমাদের পেছনের দিগন্ত কে ফরসা করতে হবে, যেখান থেকে এসব ঘটনাবলির উদয় ঘটে। কেননা পুঁজিবাদী সমাজে সাংগঠনিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক বলপ্রয়োগের মর্ম বোঝা জরুরি। কারণ অদৃশ্য সিস্টেমিক বল প্রয়োগই তার বিপরীতে ব্যক্তির বলপ্রয়োগের ঘটনার জন্ম দেয়। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা সাধারণত বল প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে টিকে থাকে।

জিজেক আরো বলেন, 'উত্তর মতাদর্শিক যুগ সহিংস বিক্ষোভ কোনো সুনির্দিষ্ট দাবী-দাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হচ্ছে না, বরং রাষ্ট্র ও প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের ফলে এইসব সহিংস বিক্ষোভের ঘটনা ঘটছে। পুঁজির দাপটের মুখে কোণঠাসা হয়ে পড়া মানুষ সহিংস বিক্ষোভের মধ্য দিয়েই নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। জিজেক প্রশ্ন তুলেছেন, রাষ্টের আইন বহির্ভূত বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের চেয়ে তুচ্ছ নয় কি? তিনি আরো প্রশ্ন তুলেন, আজকের দিনের যাবতীয় সমস্যাগুলোকে কেন শুধুমাত্র সহনশীলতার অভাবজনিত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কেন এই সমস্যাগুলোকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য ও অন্যায়জনিত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে না? কেন এই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান হিসেবে রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিবর্তে সহনশীলতার নীতিকে প্রস্তাব করা হচ্ছে। কারণ রাজনীতির কালচারিকরণ (ঈষষঁৎরংধঃরড়হ ড়ভ চড়ষরঃরপং) লিবারেল সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদীদের মতাদর্শিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যজাত সমস্যাগুলোকে তাই সাংস্কৃতিক সমস্যা হিসেবে হাজির করা হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে জিজেক ইঙ্গিত করেন, বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র কাঠামো বজায় রেখে এই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের সমাধান সম্ভব নয় বলে সাংস্কৃতিক ভিন্নতার দিকে আমাদের নজর সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' (লেভিন আহমেদ, জিজেকের ভায়োলেন্স : পুঁজিবাদী সমাজে বলপ্রয়োগের নোতুন বিন্যাসের আলেখ্য)

সহিংস আন্দোলন স্বাভাবিক জনজীবন যেভাবে থমকে দেয় তা শহরের মধ্যবিত্ত, পলিটিক্যাল এলিট ও সংস্কৃতিসেবী সুশীল সমাজের কাছে রীতিমত ভীতি জাগানিয়া। এমনকি শহরের শান্তি প্রিয় নিম্নমধ্যবিত্ত তাদের প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে সহিংসতা

দেখলে যে কোনো ন্যায্য আন্দোলনকে অভিসম্ াত দিয়ে শুর৬ করে। ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া আকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও তথাকথিত প্রগতিশীল রাজনীতির পশ্চাতমুখী প্রবণতা এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। এদের শিরোমণি দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামানসহ অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা ২৩ তারিখ থেকেই ছাত্রদের বর্বরোচিত নৈরাজ্যবাদী আখ্যা দিয়ে তাদের সহিংস হয়ে উঠার কারণ অনুসন্ধান না করেই এর ভিতর নানা ধরনের ষড়যন্ে র গন্ধ খুঁজে পেলেন এবং গণমাধ্যমে এই গোটা আন্দোলনকে নেতিবাচকভাবে জনগণের সামনে উপস্থিত করতে একের পর এক কলাম, প্রতিবেদন ও তথ্যচিত্র প্রচার ও প্রকাশ করা শুর৬ করেছিলেন। সেনাবাহিনী ও সরকারের দমন-পীড়ন ও চরম অমানবিক পুলিশী সম্ াসকে আড়াল করাই ছিল এইসব প্রচারণার উদ্দেশ্য। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার করার অপরাধে সিএসবি নিউজ চ্যানেল বন্ধ হওয়া নিয়ে এদের কেউ একটা কথা বললেন না। উল্টো বিটিভিসহ অন্যান্য চ্যানেলগুলো পিক টাইমে দীর্ঘ সময় ধরে বিক্ষোভের সময় ভাংচুর হওয়া গাড়ি, বিল্ডিংসহ অন্যান্য স্থাপনা প্রদর্শন করে 'ছাত্রনামধারী অসভ্য বর্বর অপরাধীর বিচার চাইতে শুর৬ করলেন।'

কালচারাল এলিটরা বরাবরই শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য প্রতিরোধ সংগ্রামের ধ্বংস্মক দিকগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করে জনমনে ভীতি সৃষ্টি করার চেষ্টায় নামে। প্রতিরোধ শক্তিকে নেতিবাচকভাবে তাদের নিয়ন্ ণাধীন গণমাধ্যমে উপস্থাপনের মাধ্যমে জনগণের মাঝে বিভক্তি তৈরি করে। নিপীড়নের বির৬দ্ধে জনগণের যে কোনো ঐক্যের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করার মিশনে থাকে। এ মিশনে তাদের ভাড়াটিয়া বাহিনী পরজীবী, সংস্কৃতিসেবী সুশীল সমাজকে কাজে লাগানো হয়। যাদেরকে শোষক শ্রেণির প্রয়োজনেই তারা পরিকল্পিতভাবে জনগণের সামনে আদর্শবাদী, মানবতাবাদী, দেশপ্রেমিক মহাপুর৬ষ আকারে প্রতিষ্ঠিত করে জনগণের বির৬দ্ধেই ব্যবহারের জন্য।

কথা হলো সেনাবাহিনী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন মুখোমুখি হয় জনগণ তখন তাকে কিভাবে দেখে। সেনাবাহিনীর নব্বই ভাগ সৈনিক আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের শ্রেণিগত অবস্থানটা স্ ষ্ট করা দরকার। সেনাবাহিনী যেমন যখন যে রাজনৈতিক ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রশিক্ষণে থাকে তখন সেই ক্ষমতার এক ছত্র হুকুম কায়েম করার মানসিকতা সম্ ন্ন হয় ছাত্ররা তেমনটা নয়।

সংবেদনশীলতা ও উদারনৈতিক পরিম ালে বসবাস করার কারণে ছাত্ররা বরাবরই দ্র৬ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকে। একই সাথে ছাত্র অবস্থায় একটা রূপান্ রের মধ্য দিয়ে যাওয়ার কারণে ছাত্রদের শ্রেণিগত প্রবণতা নির্দিষ্ট করা দুষ্কর।

জিমনিসিয়ামে অবস্থিত ক্যাম্ে র বাইরে এসে ছাত্রদের প্রোগ্রাম শেয়ার করতে গিয়ে (খেলা দেখতে গিয়ে) ছাত্রদের সাথে সেনাবাহিনী যে আচরণ করেছে তা কোনো প্রশিক্ষিত সৈনিকের আচরণের পরিধিতে পড়ে না। জর৬রি অবস্থার সময় সেনা হেফাজতে জানুয়ারি হতে আগস্ট ২০০৭ অবধি ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এ তথ্য স্ ষ্টতই ওই মুহ র্তে সেনাবাহিনীর ক্ষমতার বিকারের সাক্ষ্য দেয়। তো সৈনিকদের এহেন আচরণের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বাংলাদেশের সিভিল মিলিটারি সম্ র্কের ইতিহাস খতিয়ে দেখতে হয়। সেই পাকিস্ ান আমল থেকেই বিভিন্ন সময়ের সেনা শাসনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি স্ ষ্ট হয়ে যাবে। দেশের পলিটিক্যাল এলিটরা প্রাতিষ্ঠানিক সেনাবাহিনীকে শুর৬ থেকেই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসম হের পরিকল্পনা ও অর্থায়নে জনবি ছন্ন 'কাউন্টার ইন্সারজেন্সি ফোর্স' হিসেবে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যে সেনবাহিনী

আজ সাধারণ মানুষের ভাষা বুঝতে অপারগ এবং স্বশস্ তার অপার ক্ষমতার দম্ভে কোনো সমালোচনাও সহ্য করতে নারাজ। এসব কারণে সেনাবাহিনী যখন পাবলিক ফাংশনে জড়িয়ে পড়ে সেনাবাহিনী সম্ র্কে জনমনের ভীতি, সংশয় ও পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে জনগণ কখনোই তাদেরকে ইতিবাচকভাবে নেয় না। নানা ঘটনায় বিহ্বল জনতা আবেগ ও ক্রোধের প্রাবল্যে বেপরোয়া হয়ে সেই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটায়। খেলার মাঠে বৃষ্টির কারণে ছাত্রের ছাতা খোলা এবং তার ফলে সেনা সদস্যদের খেলা দেখতে অসুবিধা হওয়ায় ছাত্রদের অপমানসুলভ কথাবার্তা ও শারীরিক লাঞ্ছনা ছাত্রদের মর্যাদাবোধে আঘাত হেনেছিল। যা পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বার৬দ্ ূপে অগ্নি সংযোগের মতো ঘটনা।

২২ তারিখ দৈনিক প্রথম আলোতে লেখা কলামে দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ও টি.আই.বির পরিচালক ড. মোজাফফর আহমেদ লেখেন'বিষয়টিকে শুধু আইনশৃ খলার আবরণে দেখলে চলবে না।' তিনি ছাত্র-শিক্ষক সম্ র্কের পটভূমিতে ঘটনাটা দেখার চেষ্টা করেন। তিনি অভিযোগ করেন বিকালবেলা খেলার মাঠের ঘটনার পরপরই প্রো-উপাচার্যের নেতৃত্বাধীন শিক্ষকদের সাথে সেনা কর্মকর্তাদের আলোচনা হয়। তিনি আরো অভিযোগ করেন, 'শিক্ষকরা বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সাথে কোনো আলোচনা করেননি এমনকি যে হলের ছাত্ররা প্রহৃত-আহত হয়ে হলে এসে অবস্থান নেয়, সেই হলের প্রভোস্ট ও হাউস টিউটররা এদের কোনো খোঁজখবর নেয়নি এবং এদের বিক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা করেননি। দীর্ঘ সময় ধরে এ বিক্ষোভ চলেছে, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলেছে। এ সময় হাউস টিউটররা, প্রভোস্টরা, প্রক্টরেরাসহ ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য কী করছিলেন সেটা আমার অজানা।'

২৪ আগস্ট গণমাধ্যমকে ড. কামাল হোসেন বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার করে দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও স্বার্থন্বেষী অপরাজনীতিতে যুক্ত।'

আমরা জিজেকের ম ল্যায়নের সুস্ ষ্ট ম ল্যায়ন দেখতে পাই ঢাকার কালচারাল পলিটিক্যাল এলিটদের চিন্ ায়। বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সম হে যেভাবে অধিকাংশ ছাত্রকে অপছন্দের বিষয়ে পড়তে বাধ্য করা হয়, ছাত্রদের পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধার অভাবে ভুগতে হয়, হলগুলোতে সিটের অভাবে দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রের মতো কোনো মতে থাকতে বাধ্য হতে হয়, তার উপর ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনগুলো কর্তৃক ছাত্রদের ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করে যেভাবে তাদের রাজনৈতিক কর্মস চিতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয় তা সিস্টেমিক ভায়োলেন্সের এক ভয়াবহ নজির। তার উপর 'মড়ার উপর খাড়ার ঘা' হয়ে এসেছিল জর৬রি অবস্থাকালীন সময়ে দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পরিস্থিতি (যা বিক্ষোভের পটভূমি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে)। আগস্ট অভ্যুত্থানের কেন্দ্রে থাকা ইউটোপিয়াকে আড়াল করতে এসব পরজীবী, ভাড়াটে, মের৬দ ীন বুদ্ধিজীবী যে ষড়যন্ ও সাংস্কৃতিক মনস্ াত্ত্বিক সমস্যাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করেছে জনমনে তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তাই ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রচিন্ ার বিনির্মাণে যে কোনো ছাত্র আন্দোলনকে এই প্রভাবকে মোকাবেলা করার মতো নীতি ও কৌশল নিয়ে আরো সিরিয়াসলি ভাবা দরকার।

কি ছিল এ বিক্ষোভের কেন্দ্রস্থ ইউটোপিয়া? যার সাথে রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান বিন্যাস তথা সিস্টেমিক ভায়োলেন্সের উপর ক্রমবর্ধমান অসন্ োষ ছাত্রদের গণঅভ্যুত্থানে প্ররোচিত করেছিল তা স্ ষ্ট করে তোলাই আজকের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম জর৬রি

কাজ।

উৎসর্গ

রাজশাহীতে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ চলাকালে নিহত
রিকশাশ্রমিক আনোয়ার হোসেন ও প্রয়াত ছাত্রনেতা সুজত দে মলয়

একরাশ চিনে বাদামের খোসা পড়ে আছে রাস্ ার ওপর
এবং একটি চুপসানো বেলুন
ওর মধ্য দিয়ে
তোমাকে পেরিয়ে যেতে হবে শহর
যেতে যেতে তুমি দেখবে
মধ্যবিত্তদের উল-াসে এখনো ভাঁটা পড়েনি
যেসব মুখোশ পরে তারা বিজয়োৎসবে যোগ দিয়েছিল
সেইসব মুখোশ পরে আছে ফুটপাতে
একটা ডুগডুগি বাজিয়ে বানরের খেলা দেখা   ছ ম্যাজিকঅলা
কাঠের বাক্স থেকে তিন তাসের জুয়াড়িরা জুয়োর দান ফেলছে আবার
একজন ইন্ডেনটার চলেছে মার্কিনীদের সঙ্গে ব্যবসা ফাঁদতে
জাপানি মোটর সাইকেলের বিজ্ঞাপনের উপর চড়ে বসেছে হাফপ্যান্ট পরা যুবতী মেয়ে
তুমি অন্বেষণ করতে করতে যাবে
কিন্তু তাকে পাবে না
কেবল চিন বাদামের খোসা পড়ে থাকবে রাস্ ার ওপর
এবং
একটি
চুপসানো বেলুন
... কাকে তুমি গ্রামে গ্রামে খুঁজছ
কাকে?
নগরের সীমান্   দ্রƒত সম্প্রসারিত হ ছ
তবু এখানে রোদ এসে পড়ছে গৃহস্থের উঠানে
একটা ষাঁড় দড়ি ছুট হয়ে সারা গ্রাম মাথায় তুলেছে
শহরের থেকে সোজা যে রাস্ া গ্রামে মিশেছে
সেখানে সে ব্যর্থ শিং উঁচিয়ে অনন্   র দিকে তাকায়
‘গণঅভ্যুত্থান খুব সহজ কম্মো নয়’
‘গণঅভ্যুত্থান খুব সহজ কম্মো নয়’
হুম...
[মধ্যবিত্ত তরƒণের জন্য সান্ত্বনা পদ্য, ফরহাদ মজহার]